আল
কুরআন
সর্বযুগের
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ
ওবায়দুল হক

আল কুরআন সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

ওবায়দুল হক মিয়া

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কুরআনের ভাষা ও রচনাশৈলীর নিপুণতা

আল্-কুরআন যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সর্বযুগের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে তন্মধ্যে উহার ভাষা ও ভাষা ব্যবহারের নিপুণতা অন্যতম। কুরআনের ভাষা আরবী; একে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা—'উম্মুল আল্-সিনা' বা সমস্ত ভাষার 'মা' অর্থাৎ উৎস বলা হয়। ভাষাগত দিক দিয়ে আরবী অত্যন্ত সহজ, সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহারোপযোগী ভাষা। পৃথিবীর প্রাচীন শহর মক্কা নগরী, যেখানে মানব জাতির পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর ইবাদতখানা কাবাঘর অবস্থিত, সেই স্থানের ভাষা আরবী এবং এই পবিত্র অমূল্য ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারী গোষ্ঠী আরবের শ্রেষ্ঠ গোত্র কুরায়শদের ভাষাও আরবী। তারপর ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায়, মক্কা নগরী পৃথিবীর নাভী বা কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। কাজেই, পবিত্র কুরআনকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবতীর্ণ করা হয়েছে সেখানকার অধিবাসীদের ভাষার মাধ্যমে। কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে এ এলাকার অধিবাসীদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ ছিল—আর তাই তাদের হিদায়ত করার জন্যে পবিত্র কুরআন আরব দেশে নাযিল করা হয়। এটাই ছিল পবিত্র কুরআন সেখানে অবতীর্ণ হওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। আরব জাতির নৈতিক চরিত্রের চরম অবনতি ঘটলেও আত্ম-মর্যাদা, সচেতনতা, শৌর্য-বীর্য, ধৈর্য, সাহসিকতা, স্মরণ-শক্তির প্রখরতা এবং আরবী ভাষা চর্চার প্রতি সীমাহীন আগ্রহ ইত্যাদি গুণের সমাবেশ তাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল। বিশ্বের সর্বত্র পবিত্র কুরআনকে এ সব গুণের অধিকারী আরববাসীর দ্বারা প্রচার করা অত্যন্ত সহজ ছিল। এ হলো পবিত্র কুরআন আরব দেশে নাযিল হওয়ার গৌণ উদ্দেশ্য। সে যুগে আরববাসীরা তাদের ভাষাকে সুন্দর, সহজ ও সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা করত। ফলে আরববাসীদের নিকট আল-কুরআনে এমন এক ভাষা উপস্থিত করা হ'লো যা দেখে সকলেই অবাক হয়ে গেল।

তাদের আশ্চর্য হওয়ার কারণগুলো হল :

১. কুরআনের ভাষা তাদের মাতৃভাষা অথচ এটা একজন উম্মী লোক

আল কুরআন সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ
ওবায়দুল হক মিয়া

ই. ফা. বা. প্রকাশনা : ১৬১১
ই. ফা. বা. গ্রন্থাগার : ৭৯১৪৩৩২

প্রকাশ কাল :
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৯৫
শাওয়াল : ১৪০৮
জুন : ১৯৮৮

প্রকাশনায় :
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ :
দেলোয়ার হোসেন

মুদ্রণে :
আজিজুল হক
ইসলামিয়া প্রেস
৯৭/২ দক্ষিণ বাসাবো, ঢাকা

বাঁধাই :
রনি বুক বাইন্ডার্স
১৭, সুকলাল দাস লেন, ঢাকা

মূল্য : নয় টাকা

AL-KURAN SARBAJUGER SRESHTHA GRANTHA : Al Quran, the best book of all time, written in Bengali by Obaidul Haque Miah and published by A.S.M. Omar Ali. Director of Publiation. Islamic Foundation Bangladesh. Dhaka. June 1988.

Price Tk. 9.00 U. S, Dollar 1.00

—হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর যবান হতে বের হচ্ছে।

২. কুরআনের ভাষা তাদেরই ভাষা, অথচ তাদের ভাষার প্রচলিত নিয়মানুসারে ইহা নাযিল হয়নি।

৩. কুরআনের ভাষা তাঁর নিজস্ব স্বকীয়তা ও অনুপম রচনাশৈলী সহকারে প্রকাশ লাভ করেছে—ইহা কোন স্থান-কাল ও পাত্র বিশেষের ব্যবহারের নিয়ম পদ্ধতিকে অনুসরণ ও অনুকরণ করেনি।

৪. কুরআন কোন গদ্য বা পদ্যের ছন্দে নাযিল হয়নি। বরং উহার কোথাও গদ্যের, কোথাও পদ্যের ছন্দ বিদ্যমান।

৫. প্রকাশভঙ্গির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আয়াত বা বাক্য পৃথক পৃথক; কিন্তু অর্থ ও ভাবের দিক থেকে পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে।

৬. পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার প্রতিটি বাক্য-বিন্যাস ও শব্দ-চয়ন অত্যন্ত সুন্দর, সাবলীল ও সহজ—এক কথায় অতুলনীয়। ফলে, অন্য ভাষার লোকেরা কুরআন শরীফ পাঠ করে রস আস্বাদন করতে পারে।

৭. প্রতিটি বাক্যের শেষে উপযুক্ত শব্দের ব্যবহার করে ছন্দ ও রসের সৃষ্টি করা হয়েছে।

৮. পবিত্র কুরআনে যদিও একই ঘটনাকে নানা স্থানে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে, তথাপি তাতে একঘেঁয়েমী ভাব নেই। বরং পৃথক পৃথক ভঙ্গীতে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে পাঠক সমাজ অভূতপূর্ব রস উপভোগ করতে পারে।

৯. কুরআনের আয়াতসমূহ এক একটি বিশেষ উপলক্ষকে কেন্দ্র করেই নাযিল হয়েছে। সে সব বিশেষ উপলক্ষে বিভিন্ন প্রশ্নের মীমাংসা ও সমাধান দেওয়া হয়েছে। কুরআনের আয়াতসমূহ মানবমনের সন্দেহ অপনোদন ও সমস্যা সমাধানের অব্যর্থ হাতিয়ার। এ রচনাশৈলী দেখে আরববাসী স্বভাবতই অবাক হয়েছিল। সম-অর্থবোধক শব্দ পর পর ব্যবহার করাতে ছন্দ ও রসের সৃষ্টি হয়েছে।

১০. বিবিধ উপমা বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনমত ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে মানব জাতি সহজে কুরআনের মর্ম বুঝতে পারে।

প্রকাশকের কথা

সাধারণত গ্রন্থ বলতে যা বোঝানো হয়ে থাকে, আল-কুরআন তার ব্যতিক্রম। আল্লাহ্ পাকের ভাষায়—ওয়াল কুরআনিল হাকীম অর্থাৎ মহা বিজ্ঞানময় কুরআন। বিশ্ব সভ্যতা ও ধর্মের ক্ষেত্রে মহা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের মূলে রয়েছে এই পবিত্র কুরআন। সারা বিশ্বের এক চতুর্থাংশ লোক কুরআনের নির্দেশে পরিচালিত। যুক্তি, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর শ্রেষ্ঠত্ব কালে কালে উন্মোচিত।

জনাব ওবায়দুল হক মিয়া 'আল কুরআন সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ'-তে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার এবং সাধারণ মানুষকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। পাঠকের কাছে এই পুস্তিকাটি সমাদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

১১. কোন একটা ঘটনা বা বিষয় সাধারণভাবে আলোচনা হলেও কোন বিশেষ ব্যক্তিকে তা ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরবী ভাষায় একে তা'রীজ বা পরোক্ষ আলোচনা বলা হয়। এর দ্বারা ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

১২. কুরআনের সূরাগুলো মহামান্য বাদশাহর আদেশ রীতিতে রচিত হয়েছে। সে জন্য সূরাগুলো ঠিক দলীলের মত মনে হয়।

১৩. কোন কোন সূরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসার মাধ্যমে শুরু হয়েছে। কোন সূরা লেখার উদ্দেশ্য দ্বারা শুরু করা হয়েছে। কোন সূরাতে পত্রাকারে পত্রের লেখক ও প্রাপকের নাম শুরু করেই আরম্ভ করা হয়েছে। কোন সূরা ঠিক শিরোনামা ছাড়াই নাযিল হয়েছে।

১৪. কোন সূরা লম্বা আবার কোনটি সংক্ষেপ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপ বর্ণনা দ্বারা কুরআনের নিজস্ব রীতি ও বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে যা অন্য কোন গ্রন্থে নেই।

১৫. পত্রের শেষে যেভাবে সারকথা বলে দেওয়া হয় কখনও মূল্যবান উপদেশ দেওয়া হয়, কখনও বা পত্রের মর্মানুযায়ী কাজ না করলে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয় তেমনি কুরআনের প্রতিটি সূরার শেষে এ রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। ফলে কুরআনের ভাষা ও রচনা যে উন্নতমানের সেটাই বোঝা যায়।

১৬. কুরআনে যেসব উপমা ও দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, সেগুলো বাস্তব ও বোধগম্য, ব্যাপক ও জ্ঞান-গর্ভ।

১৭. অকাট্য যুক্তিও কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনের কোন যুক্তিই অর্থহীন কিংবা হাস্যকর নয়।

১৮. কুরআনের এসব যুক্তি-প্রমাণ খন্ডন করার জন্য উদাত্ত আহবান করা হয়েছে। কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ দ্বারা এর গুরুত্ব ও মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯. কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে মু'মিনদের জন্য সুখ-শান্তির কথাও পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের এই বর্ণনাধারা অনবদ্য ও অপূর্ব।

২০. কুরআনে যেসব বিষয় মানব জাতির বহত্তর কল্যাণ সাধনের

দু'টি কথা

পরম করুণাময় ও দয়াময় আল্লাহ্ তায়ালার নামে

আল্লাহ্ পাক মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করে ক্ষান্ত হননি; বরং তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থাও করেছেন। সেজন্য তিনি যুগে যুগে মানব জাতিকে সঠিক পথ দেখায়েছেন তার মনোনীত ব্যক্তিবর্গ বা নবী রসুলের মাধ্যমে ; আর তাঁদেরকে যুগের চাহিদানুসারে প্রদান করেছেন কিতাব। সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী নবী-রসুলগণ আল্লাহ্ প্রদত্ত কিতাবসমূহের বিধি-নিষেধগুলো তাঁদের অনুসারীদেরকে হাতে কলমে শিক্ষা দিতেন। এ ধারা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মহানবী (সঃ) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। যেহেতু আমাদের প্রিয় নবী সমস্ত নবী রসুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এমনকি, সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ মানব, তিনি যে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নিয়ে এসেছিলেন, তা স্বভাবতই সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মূলতঃ "আল কুরআন সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ" এ শ্রেষ্ঠত্বের দিক নিয়ে নানাভাবে আলোচনা করা হয়েছে অতি সংক্ষেপে ও সহজ ভাষায়।

ঝিনুক দ্বারা সমুদ্র সেঁচা যেরূপ দুরূহ ব্যাপার, আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের দিকগুলো আলোচনা করা তেমনি দুঃসাধ্য। তথাপি যৎসামান্য চেষ্টা করেছি—কতটুকু সফলতা অর্জন করেছি তা সুধীমহল মূল্যায়ন করবেন। যদি কোন সহৃদয় পাঠক এতে উপকৃত হন, তবেই আমার গবেষণা-লব্ধ শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

জন্য উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো বিভিন্ন স্থানে পুনঃ পুনঃ অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক স্থানের বর্ণনায় নতুনত্ব রয়েছে। এরূপ বার বার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হ'লো মানুষ যাতে এসব বিষয় পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

২১. অপরদিকে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি ও শিক্ষার জন্য যে সব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোতে দ্বিরুক্তি নেই। বর্ণনাধারা অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল। এরূপ বর্ণনার উদ্দেশ্য, পাঠক সমাজ যাতে সহজে বুঝতে সক্ষম হয়।

২২. ভাষার নিপুণতা ও অলংকার এত অধিকভাবে কুরআনে ব্যবহার করা হয়েছে যে, কুরআন পাঠের সময়ে ইহার গতি, মধুরতা, ঝংকার রস নতুনরূপে পাঠক মনে অনুভূত হয়। এজন্য সারা দিন রাত কুরআন তিলাওয়াত করেও কেউ বিরক্ত, শ্রান্ত বা ক্লান্ত হয় না। কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের ইহাও একটি বাস্তব প্রমাণ।

২৩. কুরআনে শব্দ-বিন্যাসে এমন কলা-কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবু এটুকু বলতে হয়—কোন বিষয়বস্তুকে সুন্দর, সহজ ও জ্ঞানগর্ভরূপে বুঝবার জন্য অনুপমভাবে প্রয়োজনীয় শব্দরাজির ব্যবহার করা হয়েছে। সারা কুরআন পাকে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কাফিরদের শাস্তির জন্যে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, মুনাফিকদের জন্য সেই শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। তেমনিভাবে কোন একটি আয়াতের শেষে মন্তব্য করার জন্য যে শব্দ প্রয়োগের দরকার, ঠিক সেই শব্দেরই ব্যবহার করা হয়েছে।

২৪. অভিজ্ঞ পাঠকগণ যে কোন লেখকের পরিবেশিত মতামত ও সমস্যা সমাধান সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার পর কোন না কোন ভুল-ভ্রান্তি বের করতে সক্ষম হন। কিন্তু এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন লেখক, প্রবন্ধকার, সুদক্ষ ও তীক্ষ্ণ সমালোচকও একথা দাবী করতে পারেনি যে, পবিত্র কুরআনে ভাষাগত ছন্দ, রস, অলংকার শাস্ত্র, ঘটনাবলী বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বিন্দু বিসর্গ ভুল-ভ্রান্তি বের করতে পেরেছেন।

২৫. কুরআন শরীফের ব্যাপারে তাই আল্লাহ্ পাক বিশ্ববাসীর সামনে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে, ইহা এমন কিতাব যাতে কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশ নেই।

২৬. কুরআন শরীফে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তা পরম সত্য,

সূচীপত্র

নির্ভুল এবং তত্ত্ববহুল। প্রতিটি শব্দ সমন্বয়ে, প্রতিটি আয়াতে যে যে বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তা স্ব-স্ব স্থানে অটল ও ধ্রুব সত্যরূপে প্রমাণিত হয়েছে। এ পর্যন্ত এর উপর কোন সন্দেহ-প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

২৭. আল-কুরআনে কোন প্রকার অর্থহীন ও অনুমান ভিত্তিক কোন আয়াত বা বাক্য নেই, বরং সর্বশক্তিমানের পক্ষ থেকে প্রেরিত এ মহা-গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য সত্য ও সুন্দরের প্রতীক এবং বাস্তব নিদর্শন।

মানব সমাজে কুরআনের অলৌকিক প্রভাব

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কুরআনের ভাষা, অলংকার, ছন্দ, রস ইত্যাদির যে অপূর্ব ব্যবহার ও প্রয়োগ করার কথা যৎসামান্য আলোচনা করা হয়েছে, তাতে বোঝা যায় যে, এমন একখানা মহাগ্রন্থ স্বভাবত জ্ঞানী-গুণী ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট অলৌকিকভাবে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে। মানুষের নিজস্ব বিবেক ও চিন্তাশক্তির অহমিকা এ পবিত্র কালামের প্রভাবে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয় এবং মহাসত্যের সন্ধান লাভে সক্ষম হয়। কুরআনে এমন আকর্ষণীয় শক্তি আছে, যা শ্রবণে শত্রু-মিত্র, জ্ঞানী-মূর্খ, কবি-সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক, রাজা-বাদশাহ পর্যন্ত প্রভাবান্বিত হয়েছে এবং স্বেচ্ছায় কুরআনের গৌরব স্বীকার করেছে। কুরআন পাক মধুর সুরে পাঠ করলে শুধু মানবজাতি কেন, পশু পক্ষী পর্যন্ত মোহিত হয়েছে—ইতিহাস তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে।

মক্কার কাফির কবি-সাহিত্যিক গোষ্ঠি সব সময় ছন্দময় ও মন-মাতানো ঝংকারে সাহিত্য চর্চা করে সারা আরব দেশ মোহিত ও প্রভা-বান্বিত করে রাখত। সাহিত্য চর্চার জন্য সারা আরববাসী নিজেদের ধন-দৌলত, বুদ্ধি বিবেচনা ও চিন্তা শক্তিকে অহরহ কাজে লাগানোর জন্য মোটেও কুন্ঠাবোধ করত না। সে আরববাসী পবিত্র কুরআনের এক-খানা আয়াতে প্রভাবান্বিত হয়েও ইসলাম কবুল করতে লাগল। কট্টর কাফিররা এ অবস্থা দেখে বড়ই ব্যথিত হল। তারা লোকদেরকে নবীজীর নিকট যেতে এবং কুরআন শুনতে সর্বপ্রকারে বাধা প্রদান করতে লাগল। মানুষের মনে কুরআন যে অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, নিম্নে কতিপয় ঐতিহাসিক ঘটনা সংক্ষেপে পাঠক সমাজে পেশ করা হ'ল ঃ

১. যে মহামানবকে কেন্দ্র করে সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাযিল হয়েছিল, তিনি এ গ্রন্থ শুনে, পড়ে ও বুঝে যেভাবে প্রভাবান্বিত হতেন, তা ভাষায় ব্যক্ত করা সহজ নয়। তবে তিনি কখনও কখনও কুরআন তিলাওয়াত করতঃ আল্লাহর ভয়ে এতো ভীত হতেন যে, তাঁর চেহারা মুবারকের রঙ বদল হয়ে যেত। চক্ষু হতে অবিরত অশ্রু প্রবাহিত হতো। তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। কোন কোন সময় বার বার আয়াত তিলাওয়াত করতেন। রাতের বেলা আরামের নিদ্রাকে হারাম করে গভীর মনোযোগের সাথে নামাযের মধ্যে এত অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত

করতেন যে, তাঁর পা মুবারক ফুলে যেত। অথচ এ বাহ্যিক কষ্টকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নি।

২. কাফিরদের শত বাধা-নিষেধ কোন কাজে আসল না। পবিত্র কুরআনের আয়াত শুনামাত্র বিমুগ্ধ হয়ে মানুষ দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। এবার তারা স্থির করল, নবীজী কুরআন তিলাওয়াত করবেন আর তারা সেখানে হৈ চৈ করবে, যেন কুরআন শুনে কেউই প্রভাবান্বিত না হয়। তাদের এ ঘৃণ্য চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

৩. মক্কার কাফিররা নবীজীর উপর নাযিলকৃত কালামকে প্রকাশ্য যাদুবিদ্যা বলে বেড়াতে লাগল। তারা যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ও কবিতা রচনায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি উৎবা বিন্ রবীয়াকে কালামে পাক যাচাইয়ের জন্য পাঠালেন। উৎবা নবীজীর নিকট গিয়ে সন্ধির কয়েকটি শর্ত পেশ করল। নবীজী এর জবাবে সূরা 'হা-মীম-সাজ্দা' তিলাওয়াত শুরু করলেন। উৎবা হাত দ্বারা নবীজীর মুখ বন্ধ করে বলল, "আত্মীয়তার খাতিরে এটা বন্ধ করুন।" এর পর উৎবা একেবারে নিজ বাড়ীতে গিয়ে উঠলে বাড়ী হতে আর বের হলেন না। অবস্থা বেগতিক দেখে স্বয়ং আবু জাহল তার বাড়ীতে গিয়ে উঠল এবং বলল, "বুঝা গেছে তোমারও মাথা ঠান্ডা হয়ে গেছে।" উৎবা বলল "তোমরা জান, আমি আরবে সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তি, আমাকে ধনের লোভে কেউ বশ করতে পারে না। আসলে, তিনি (নবীজী) আমাকে যে কালাম শুনালেন, উহাতে আল্লাহ্-পাকের আযাবের হুমকি ছিল। আমি তাঁকে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে চুপ করিয়েছি। আমার ভয় হচ্ছে, তোমাদের উপর শক্ত আযাব এসে না পড়ে।"

৪. ওয়ালীদ বিন্ মুগীরা আরবের একজন খ্যাতনামা কবি। সে এতই দাম্ভিক ছিল যে, অন্য কাউকে ওর নিজের সমকক্ষ মনে করত না। কুরায়শগণ তাঁকে অঢেল ধন-দৌলত ও সম্মানের লোভ দেখিয়ে কুরআনের মত একটি আয়াত রচনা করতে পীড়াপীড়ি শুরু করল। সে এতে অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল, "হে কুরায়শগণ, "তোমরা তাঁকে (নবীজীকে) যাদুকর বলছো, আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, তিনি যাদুকর নন। আমি যাদু ও মন্ত্র-তন্ত্র দেখেছি। তোমরা তাঁকে কবি বলছো। কিন্তু তিনি কখনও কবিতা রচনা করেন নি। কারণ আমি সকল প্রকার কবিতায় পারদর্শী। তোমরা তাঁকে পাগল (নাউযুবিল্লাহ) বলছো। আল্লাহ্র শপথ, তিনি পাগল নন। আমি পাগল ও তাদের কার্যকলাপ দেখেছি। হে কুরায়শগণ, তোমরা নিজেদের অবস্থা চিন্তা কর। আল্লাহ্র

শপথ, পবিত্র কুরআন নিশ্চয়ই অমূল্য সম্পদ এবং ইহা আমাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে।"

৫. প্রসিদ্ধ কবি তোফায়েল বিন আমর্ মক্কা নগরীতে আসেন। সব কাফির তাকে ঘিরে দাঁড়াল এবং বহু উপদেশ প্রদান করল যেন তিনি কালামে পাক না শুনেন। তিনিও প্রথম অবস্থায় কাফিরদের এসব উপদেশ ও সতর্কবাণী মেনে চললেন। হজ্জের সময় রীতিমত কানের ভেতর কাপড় ঢুকিয়ে কাবা শরীফ তওয়াফ করতে লাগলেন। এ সময় নবীজী নামাযে রত ছিলেন। তোফায়েল বলেন, "ভাবলাম, আমি তো কবি, যাদুবিদ্যা সহজে বুঝব। তার কথা শুনতে আপত্তি কি ? ভাল হলে গ্রহণ করব, ভাল না হলে গ্রহণ করব না।" এ ভেবে আমি কান হতে কাপড় সরিয়ে ফেললাম। তিনি নামাযে যে আয়াত পড়ছিলেন তা শুনতে লাগলাম। উহা শুনে এরূপ বিমোহিত হয়ে পড়ি যে, আমি সাথে সাথে নবীজীর দরবারে হাযির হয়ে বললাম, "আল্লাহ্র শপথ, আমি ইহা অপেক্ষা উত্তম কালাম আর কখনও শুনিনি। অতঃপর আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি।"

৬. হযরত যুবায়র বিন্ মুত'আম (রাঃ) বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে মদীনা শরীফ আসেন। নবীজী তখন নিম্নের আয়াতটি পাঠ করছিলেন :

"তারা কি নিজেই সৃষ্টি হয়েছে; কিংবা তারাই নিজেদের সৃষ্টি-কর্তা অথবা তারা কি আসমান-যমীন তৈরী করছে.....................?" হযরত যুবায়র (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত শোনার সাথে সাথে আমার মন কোথায় চলে গেল, তা আমার জানা নেই। তৎক্ষণাৎ আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।

৭. হযরত মুয়ায়েদ বিন্ সাবিত (রাঃ) আউস গোত্রের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাগ্মিতায় ও বাকপটুতায় বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন বলে তাঁকে 'কামিল' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। নবীজী কর্তৃক তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে তিনি বলে উঠলেন, "আপনার নিকট যা আছে, আমার নিকটও তা আছে।" নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নিকট কি আছে ?" উত্তরে তিনি বললেন, "আমার নিকট লোকমানের হিকমত আছে।" নবীজী তাকে পড়ে শুনাতে বললেন। সে কতকগুলি কবিতা পড়ে শুনাল। হযরত (সঃ) বললেন, "ইহা ভাল কথা। কিন্তু আমার নিকট কুরআন পাক আছে। ইহা তোমার কথা অপেক্ষা উত্তম।" এরপর নবীজী কয়েকটি আয়াত পড়ে শুনালেন। তিনি স্বীকার করলেন যে, ইহা সত্যিই আলোকবর্তিকা। অতঃপর তিনি

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

৮. আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর দরবারে হযরত জাফর তাই-য়্যার (রাঃ) কুরআনে পাকের সূরা মারয়াম পাঠ করছিলেন। ইহা বাদ-শাহের উপর এত বেশী প্রভাব বিস্তার করল যে, তিনি কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, "মুহাম্মদ (সঃ) তো ঐ রসূল, যাঁর সংবাদ হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ) দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ পাকের শোকর যে, আমি তাঁর জামানা পেয়েছি।

৯. লবীদ বিন্ রবীয়ার দেশ ছিল ইয়ামন। তিনি ছিলেন সম-সাময়িক কবি-সাহিত্যিকদের শিরোমণি। কবিতা রচনায় অসাধারণ ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে তিনি অপরাপর কবি-সাহিত্যিককে রীতিমত ঘৃণার চোখে দেখতেন। তাঁর এ মিথ্যা দাবী খণ্ডনের জন্য এবং দর্প চূর্ণ করার জন্য কুরআন শরীফের ছোট একটি সূরা কাবা-ঘরে টাঙানো হল। লবীদ এ খবর পেয়ে কাবা ঘরে গিয়ে হাযির হলেন। কুর-আনের আয়াত পড়ে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং সাথে সাথে তাঁর এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হল যে, ইহা আল্লাহ্‌র কালামে পাক। পরিশেষে তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন।

১০. ইয়ামনের অধিবাসী জোমাদ আজ্‌দির অত্যন্ত জ্ঞানবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ঝাড়-ফুঁকের দ্বারা পাগল ও যাদু মন্ত্র-তন্ত্র ভাল করতেন। নবীজী পাগল হয়ে গেছেন অথবা যাদুবিদ্যা শিখেছেন এজন্য তিনি নবী-জীর চিকিৎসার জন্যে মক্কা নগরীতে এসেছিলেন। নবীজী তাঁর সামনে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করত কলেমা শাহাদাত পাঠ করার সাথে সাথে সে চীৎ-কার করে বললেন, "আল্লাহ্‌র শপথ, আমি যাদুকরদের যাদুমন্ত্র-তন্ত্র, কবিদের কবিতা, ভবিষ্যত বক্তাদের কথা শুনেছি। আপনার কথা কিন্তু অন্য প্রকারের। ইহা সমুদ্রেও প্রভাব বিস্তার করবে। হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনি হাত প্রসারিত করুন, আমি আপনার নিকট ইসলাম গ্রহণ করি।"

১১. কথিত আছে যে, হযরত ফুযায়েল বিন্ আয়ায খলীফা হারুন-অর-রশীদের আমলে সূফী ছিলেন। তিনি প্রথম বয়সে ডাকাতি করতেন। এক স্ত্রীলোকের সাথেও তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। একদা একটি কাফেলাকে আক্রমণকালে তিনি সে কাফেলার একজনকে কুরআন পাকের আয়াত আবৃত্তি করতে শুনলেন। আয়াত শুনামাত্র তিনি পাগলের মত চীৎকার আরম্ভ করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলেন এবং সমস্ত অপকর্ম হতে তওবা করতঃ বাকী জীবন পরহেযগারীর সাথে কাটিয়ে পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন।

এ মহাগ্রন্থে এমন এক খোদায়ী শক্তি ও আকর্ষণ বিরাজমান যা একটু চিন্তা করলেই উপলব্ধি করা যায়। কোন একজন ভাল কারী মিষ্ট সুরে পবিত্র কুরআন আবৃত্তি করলে শ্রোতারা গভীর মনোযোগ সহকারে তন্ময় হয়ে শুনে থাকে। শ্রোতাদের কেউ কেউ অস্থির ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মনের সকল প্রকার দুশ্চিন্তা ও কলুষতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে যখনই আপনি কুরআন পাককে আল্লাহ্‌র কালাম মনে করে তাকে শ্রদ্ধা-সহকারে শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করবেন, তখনই আপনার মনে আল্লাহ্‌র তরফ হতে মানসিক শান্তি না এসে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ভীষণ দৈহিক অসুস্থতার সময় কালামে পাকের তিলাওয়াতের মাধ্যমে রোগী শান্তি ও আরাম অনুভব করে। পবিত্র কুরআনের আয়াত পাঠ করে পানিতে দম করে অসুস্থ ব্যক্তিকে খাওয়ালে কিংবা আয়াত লিখে তাবিজ বানিয়ে দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

মানব মনে পবিত্র কুরআনের প্রভাব বিস্তারের আর একটা প্রমাণ হল জ্ঞানের অভাব কিংবা শয়তানের ধোঁকায় কুরআন হাদীস ও ইসলামী শরীয়তের কোন বিষয়ে যদি কারও মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তবে মনোযোগ সহকারে কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের পর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করলে উক্ত সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। এটা অত্যন্ত পরীক্ষিত ব্যাপার।

সারকথা, মানব মনে পবিত্র কুরআনের প্রভাব বিস্তারের এরূপ অসংখ্য প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে সংক্ষেপে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

মানব চরিত্রের উন্নতি সাধনে কুরআনের ব্যবস্থাপত্র

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেন: "ফা ইম্মা ইয়া'-তিয়ান্নাকুম মিন্নী হুদান্, ফামান্ তাবিয়া হুদায়া ফালা খাওফুন্ আলাই-হিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্ যানূন।" 'আমার পক্ষ হতে তোমাদের কাছে (সম্মুখে) জীবন যাপনের জন্য হিদায়ত বা বিধি-নিষেধ আসতে থাকবে। যারা তা অনুসরণ করবে তারা মোটেও অনুতাপ করবে না এবং ভয়ে ভীত হবে না।' (২ : ৩৮)

পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে মানব জাতির চরিত্রে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এ সব ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার ব্যবস্থা করলেন। কুরআনের অপর নাম ফুরকান অর্থাৎ সৎ ও অসৎকে পৃথককারী। বাস্তবিকই আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে যুগে যুগে মানব চরিত্র সংশোধনের জন্য, উন্নত করার জন্য ও সকল প্রকার কলুষতা হতে মানবতাকে মুক্ত করার জন্য একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা-পত্র দান করেছেন। যাদের তকদীর ভাল, তারা কুরআনী ব্যবস্থাপত্র ও বিধি-নিষেধ মেনে চলে ইহকালেও অমর হয়েছেন এবং পরকালেও আরাম আয়েশ লাভ করবেন। পক্ষান্তরে যারা কুরআনের নির্দেশিত বিধি-নিষেধ মানে নাই; তারা শয়তানী চক্রে পড়ে জীবন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পদ-দলিত, মথিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে এ পৃথিবী হতে বিদায় নিয়েছে। সমগ্র মানব জাতির জন্য কুরআন বহন করে এনেছে সৎপথে জীবন-যাপন করে দুনিয়া ও আখিরাতে সুখ-শান্তি ভোগ করার ব্যবস্থা।

এবার আমরা মানব চরিত্র সংশোধন ও উন্নত করার জন্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কতকগুলো বিধি-নিষেধ পাঠক সমাজে পেশ করলাম :

১. অহংকার ও গর্ব না করার জন্য পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে হুঁশিয়ার করা হয়েছে—"অহংকার পতনের মূল। গর্বিত লোকের জন্য পরকালে বেহেশ্ত নাই।"

২. লোভ-লালসাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

"যে ব্যক্তি লোভকে সংযত করতে পেরেছে, সে ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালে সুখ-শান্তি লাভ করে কামিয়াবী হাসিল করেছেন।" (৬৪ : ১৬)

৩. পর-নিন্দা ও হিংসা-বিদ্বেষ না করার জন্য বারবার তাগিদ করা হয়েছে। ইসলাম-পূর্বকালে বহু জাতি হিংসা ও বিদ্বেষের ও পরনিন্দার কারণে ধ্বংস হয়েছে। কাহারো অসাক্ষাতে বদনাম করার মত জঘন্য পাপকে নিজ মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়ার চেয়েও ঘৃণ্য বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। (৪৯ : ১২)

৪. বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা ও স্বীয় কর্মক্ষেত্রে লেগে থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা একান্ত প্রয়োজন (৪৯ : ১২)। ধৈর্যশীলদের পাশেই আল্লাহ্‌পাক থাকেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কুদরত ও রহমত ধৈর্যশীলদের সাথেই আছে। (২ : ১৫৬)

৫. অলস ও বেকার জীবন না কাটিয়ে কর্মক্ষেত্রে জল ও স্থলে, যেখানে থাকুন না কেন ঝাঁপিয়ে পড়া এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সম্পদ-রাজির অনুসন্ধান চালানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (৬২ : ১০)

৬. সর্ব অবস্থায় মানুষের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা, প্রেম-প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বভাব স্থাপন করার জন্য বহু উপদেশ, আদেশ ও তাকিদ দেওয়া হয়েছে। (২ : ৮৩)

৭. সীমাবদ্ধ এলাকায় জীবন যাপন না করে যথাসম্ভব দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করবে। ইহাতে আল্লাহ্‌র কুদরত, নিয়ামত ও প্রাচীন যুগের জালিমদের জন্য যেসব শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছিল তা দেখে নিজেদের চরিত্রের উন্নতি সাধন ও শিক্ষালাভ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। (১৬ : ৩৬)

৮. স্বীয় কাজ-কর্ম, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, খাওয়া-পরা, বেশ-ভূষা ইত্যাদিতে মধ্যম-পন্থা অবলম্বন করার জন্য প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌পাক মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারীকে ভালবাসেন (৪৯ : ৯) নবীজীও ইরশাদ করেছেন—"মধ্যম পন্থাই উত্তম পন্থা।"

৯. মদ্যপান, জুয়া, বাজি পোড়ান ইত্যাদিকে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। এসব শয়তানী কাজ দ্বারা জীবনে শুধু দুঃখ কষ্ট ও বেদনা আসে। (৫ : ৯০)

১০. যিনা বা ব্যভিচারের কাছেও না যাবার জন্য কঠোর তাগিদ করা হয়েছে। হঠাৎ কাহারো বাড়ীতে বিনা অনুমতিতে বা বিনা সালামে প্রবেশ

হারাম করা হয়েছে। (২৪ : ২৮)

স্বার্থের লোভে গরীব, য়াতীম ও অসহায়ের ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করার অর্থ নিজের উদরকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করার মত জঘন্য ও মারাত্মক কাজ বলা হয়েছে। (৪ : ১০)

১৪. জিনিসপত্র কেনা-বেচার সময় মাপে কম না দেওয়ার জন্য হুঁশিয়ার করা হয়েছে। যারা মাপে কম দেবে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৫. নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন সম্পত্তি, দেহের শক্তি ও চিন্তা-শক্তির দ্বারা হলেও পরকে যথাসম্ভব সাহায্য-সহানুভূতি করা একান্ত প্রয়োজন। "আল্লাহ্ পাক পরোপকারীকে বড়ই ভালবাসেন।"(২ : ১৯৫)

১৬. বৃথা কাজ-কর্ম, ধ্যান-ধারণা ও আলাপ-আলোচনা ত্যাগ করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা ভদ্র ও উন্নত জীবন-যাপনে সক্ষম হই। (২৩ : ৩ । ১০৫ : ১৮)

আমাদের প্রতিটি কাজ ও কথার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সেজন্য আমাদিগকে সাবধান থাকতে হবে।

১৭. আল্লাহ্‌র প্রদত্ত নিয়ামত প্রয়োজনমত ভোগ করতঃ শোকর করার জন্য বলা হয়েছে। কৃপণতা ও বৈরাগী অবলম্বন না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (৪৭ : ৩৮)

১৮. স্ত্রী-পুত্র মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজনসহ স্নেহ-মমতা ও হাসি-খুশিতে বসবাস করার জন্য বলা হয়েছে। একে অন্যের দোষ-ত্রুটি ও অন্যায়কে যথাসম্ভব ক্ষমা করতঃ মহত্ত্ব ও বীরত্ব প্রকাশ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। (৩ : ১৩৪)

১৯. ক্ষণস্থায়ী জীবনে এ পৃথিবীতে ধন-সম্পত্তি ও মালপত্র সংগ্রহ করার পেছনে সর্বদা লেগে না থাকার জন্য বলা হয়েছে। (৯ : ৩৮)

পরবর্তী জীবন অর্থাৎ আখিরাতের কাজকর্ম করার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২০. পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং বৃদ্ধ বয়সে তাদের সেবা করতঃ দোয়া সংগ্রহ করার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ করা হয়েছে। (১৭ : ২৩–২৪)

২১. এমনকি অপর ধর্মাবলম্বী লোকজনের সাথেও ধর্ম নিয়ে হিংসা-বিদ্বেষ না করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। (২২ : ৫৬)

২২. মিথ্যা কথা বলা, পরকে ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া ইত্যাদি খারাপ কাজ হতে দূরে থাকতে হবে।

২৩. চুরি করা মহাপাপ। চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মানুষ যেন নিজ নিজ ধনসম্পদ নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। (৫ ঃ ৩৮)

২৪. সুদ খাওয়া মহাপাপ। সুদের কারবার না করার জন্য হুঁশিয়ার করা হয়েছে। নবীজী সুদ খাওয়া, দেওয়া ও সুদ লেখকের প্রতি একই ধরনের পাপ বলে উল্লেখ করেছেন। (২ ঃ ২৭৬)

২৫. মানুষের সাথে ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে। (১৬ ঃ ১২৫)

২৬. বিপদে-আপদেও ভীত না হয়ে সাহস, শক্তি, ধৈর্যধারণ করে জীবনের পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। (২ ঃ ১৭২)

২৭. কাউকেও বিদ্রূপাত্মক নামে না ডাকার তাগিদ করা হয়েছে।

২৮. অহেতুক তর্ক ও আলাপ-আলোচনা হতে দূরে থাকতে হবে।

২৯. সকল প্রকার লোভ-লালসা দমন করার জন্য বলা হয়েছে এবং ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেককেই নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করতে হবে। কুরআন পাকে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, "ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই।"

কুরআন পাকে আল্লাহ্ পাক আরও উল্লেখ করেন, "যে অণু পরিমাণ সৎ কাজ করেছে, সে উহার প্রতিদান পাবে আর যে অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করেছে সেও উহার প্রতিদান পাবে।"

৩০. মুক্ত ও পরিষ্কারভাবে নিজ নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা ও জ্ঞান-সম্পদকে কাজে খাটাবার আহ্বান জানান হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের কুদরত, নিয়ামত, রহমত, হায়াত-মউত ইত্যাদি স্মরণ করে তাঁর অনুগত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্ধ বিশ্বাস না নিয়ে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করার জন্য ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। (১৮ ঃ ২৯)

এ বিশ্বের যত কিছু সৃষ্টবস্তু আছে—সব কিছুর প্রতি চিন্তা করতঃ আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করতে হবে। এতে নিজের গবেষণা-শক্তি বৃদ্ধি পাবে, অন্তরের সীমাবদ্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাব দূর হবে।

মানবজাতির সংশোধন ও উন্নত করার জন্য আল্লাহ্‌র কুরআন এক অব্যর্থ হাতিয়ার ও অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। এ পবিত্র কিতাব যাঁর উপর নাযিল হয়েছিল তাঁর সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ পাক বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে আমি একজন উত্তম চরিত্রের অধিকারী রসূল পাঠিয়েছি।" হযরত মুহাম্মদ (সঃ) উত্তম চরিত্রের অধিকারী বলেই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত জীবনব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর উত্তম চরিত্রে মুগ্ধ হয়েই বহু অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। এজন্য কাউকেও কোন প্রকার ঘুষ, বখ্‌শিশ বা লোভ দেখানোর প্রয়োজন হয়নি। যুগ যুগ ধরে নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণকারী আসতেথাকবে। পবিত্র কালামের ধারক ও বাহক হিসেবে নবীজী সে অনুযায়ী নিজের চরিত্র গঠন করেছিলেন। তাঁর জীবন-চরিত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে কেউ পাঠ করেছে বা করে সে-ই মুগ্ধ হয়। মুসলমান হবার সৌভাগ্য না থাকলেও অন্ততঃপক্ষে তার অন্তরে ভাল ধারণা সৃষ্টি হয়। ফলে নবীজীর অবর্তমানেও দেশবরেণ্য ও খ্যাতনামা অমুসলিম জ্ঞানী-গুণিগণ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁরা নবীজী সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ অভিমত প্রদান করেছেন।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, ''মানব চরিত্রের উত্তম গুণাবলীর পূর্ণতা দান করার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে।"

মানব চরিত্র সংশোধন ও গঠনের এ মহান ব্রতে বিশ্বনবী (সঃ)-এর প্রধান হাতিয়ার ছিল পবিত্র কুরআন। বস্তুত কুরআন হলো মানব চরিত্র গঠনের অমোঘ ব্যবস্থাপত্র।

মানবতার সেবায় কুরআনের উপদেশ

মানব জাতির স্বার্থ ও অধিকারকে রক্ষার জন্য একমাত্র কুরআনই পরিষ্কারভাবে স্থায়ী সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছে। দীন, দুঃখী, বিপদগ্রস্ত, য়াতীম, বিধবা, রোগ-শোকে আক্রান্ত প্রমুখ ব্যক্তিকে প্রয়োজন-বোধে আর্থিক সাহায্য করা, মৌখিকভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কুরআনে বলা হয়েছে। এসব মানবতার কাজ ঈমানের অংশ হিসেবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, 'কেবল পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ করাতেই পুণ্য হাসিল হয় না; বরং সত্যিকারের পুণ্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা; শেষ বিচারের দিনের প্রতি ঈমান আনা; সকল ফিরিশ্‌তা, আসমানী কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনা; আর সাথে সাথে নিকট আত্মীয়, য়াতীম, অভাবী এবং রিক্ত-হস্ত, প্রবাসী ও ভিক্ষুকদের সাহায্য করা, দাস-দাসীদের আযাদ করা।" (সূরা বাকারা—২ : ১৭৭)

কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌র ইবাদাত, তাঁর আনুগত্য ও দাসত্বের ব্যাপারে যত তাকিদ করা হয়েছে, মানব সেবার প্রতিও অনুরূপ তাকিদ আছে। মানব সেবা ছাড়া আল্লাহ্‌র ইবাদাত-বন্দেগীর কোন মূল্য নেই। কুরআন পাকে বলা হয়েছে—"তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ, যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে? সে ব্যক্তি হল—যে য়াতীমকে গলা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়; অন্নহীন ও অভাবী মানুষের খাদ্য যোগাড়ের ব্যাপারে অপরকে উৎসাহ দেয় না এবং এ ধরনের নামাযী ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। যারা মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রতিবেশীকে দিয়ে সাহায্য করতে অস্বীকার করে।" (সূরা মাউন)

মানব-সেবা ছাড়া কোন ইবাদত আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হয় না। আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে ধন-সম্পদ কেবল ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের জন্য ব্যয় করতে দেননি, যারা ধন-সম্পদ উপার্জন করতে অক্ষম, অন্ধ, খোঁড়া, পাগল, প্রমুখ লোকদেরও যথাসম্ভব সাহায্য ও সহানুভূতি করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পরের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হওয়ার জন্য আমাদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ্‌র

মনোনীত খলীফা বা প্রতিনিধির পদমর্যাদা দেয়া হয়েছে। বিত্তবানদের ধন-সম্পত্তির মধ্যে দীন-দুঃখীর জন্যও একটা নির্দিষ্ট অংশ রাখা হয়েছে। প্রতি বছর ধনিগণ গরীবকে সেই অংশ দিতে বাধ্য। শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করার হুকুম। কুরআন পাকে বিরাশিবার এই যাকাত আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। নির্দিষ্ট পরিমাণে যাকাত আদায় করার পরও অভাবগ্রস্ত ও দুঃখীদের অভাব ও দুঃখ লাঘব সম্ভব হয়না বিধায়, সাদাকা, ফিত্রা, দান-খয়রাত ইত্যাদিরও বিধান দেয়া হয়েছে। "তোমরা আত্মীয়-স্বজন এবং দীন-দুঃখী অভাবী ব্যক্তিদের (যথাযথভাবে সাহায্য করত) হক আদায় কর। যারা (দুনিয়া ও আখিরাতে) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, তাদের জন্য এ উত্তম পন্থা। আর মূলত এসব দানশীল ব্যক্তি শাস্তি হতে রেহাই পাবে।"—আল-কুরআন

অভাবী ব্যক্তিমাত্রেই সাহায্য পাওয়া দরকার এবং সাহায্য করা আমাদের ধর্মীয় ও মানবিক কাজ। এ ক্ষেত্রে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা উচিত নয়। আমাদের আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য দান খয়রাত করার জন্য কুরআনী বিধান রয়েছে। সমাজের দুঃখ-দারিদ্র মোচনকল্পে যাকাত একটা কার্যকরী বিধান; কেননা, কোন সমাজ কাঠামোই আর্থিক স্বচ্ছলতা ছাড়া স্থায়ী ও সুদৃঢ় হতে পারে না। সমাজ একমাত্র অর্থনৈতিক উপকরণাদির সাহায্যেই অভাবীদের অভাব মিটাতে পারে। এ পদ্ধতি যথার্থ অনুসৃত হলে সমাজকে ভিক্ষাবৃত্তির অভিশাপ হতে মুক্ত করা সম্ভব। এর ফলে অভাবী, উপার্জনে অক্ষম, বিকলাঙ্গ, অনাথ-য়াতীম, বিধবা প্রভৃতি দুঃখী মানুষের কাতর কণ্ঠের ধ্বনি শোনা যাবে না। সমাজ জীবনে তাদের যিল্লতের অবসান হবে। পূর্বে বলেছি শুধু যাকাত দান করলেই অভাবী মানুষের প্রতি ধনী ব্যক্তিদের দায়িত্ব ফুরিয়ে যায়না। কেননা, যাকাত দ্বারা অভাব নাও পূরণ হতে পারে। সেজন্য ইচ্ছাকৃতভাবে খুশী হয়ে মানবতার খাতিরে, মানুষের প্রতি মানুষের দরদ ও যথাযথ সহানুভূতি দেখানোর উদ্দেশ্যেই সাদাকা, খয়রাত ও দান করার কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। "হে নবী, মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, কি পরিমাণে ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন যে, (তাদের) প্রয়োজনের বেশী যা, তা দান করতে হবে।"
(২ : ২১৯)

তারপর য়াতীম ও অভাবী লোকদিগকে কিছু সাহায্য করাই কেবল যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আবশ্যক।

গরীব, দুঃখী ও বিপদগ্রস্ত হলে তাদেরকে ঘৃণা, অবমাননা ও হেয় চোখে দেখা মানবতাহীন ও জঘন্য কাজ। কুরআনে এর বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করা হয়েছে। "য়াতীমদিগকে ঘৃণাভরে গলা ধাক্কা দিওনা এবং ভিক্ষুককে বঞ্চিত করোনা। (৯৩ঃ ৮—১০)

অনাথ, য়াতীম ও দুঃখীদিগকে অপমানিত করলে আল্লাহ্ পাকও মানুষের ধন-সম্পদ কেড়ে নেন এবং তাদেরকেও অপমানিত করেন। যেমন কুরআনে উল্লেখ আছে—"মানুষকে যখন তাহার প্রভু (ধন-সম্পদ দিয়ে) পুরস্কৃত করার মাধ্যমে পরীক্ষা করেন, তখন সে (অহমিকার সুরে) বলতে থাকে, আমার প্রভু আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন, আর যদি তাকে অন্যভাবে পরীক্ষা করে অর্থাভাবে ফেলেন তখন সে (অভিযোগ-স্বরে) বলে, আমার প্রভু আমাকে অপমানিত করেছেন। কিন্তু তা' কখনই হয় না (বরং তা তোমাদের কর্মফল)। তোমরা অনাথ য়াতীমকে সম্মান কর না এবং নিরন্ন (অনাহারী) মানুষের খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে অপরকে উৎসাহ দাও না ; বরং উত্তরাধিকারীদের সমস্ত সম্পত্তি নিজে-রাই গ্রাস করে বসেছ। সম্পত্তির মোহ তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। (৮৯ঃ ১৫—২০)

দুঃখী ও বিপদগ্রস্তকে যথাসম্ভব সাহায্য করার প্রতি নির্দেশ ও উৎসাহ দিয়েই আল্লাহ পাকের কুরআনী হুকুম শেষ হয়নি, ধনবান ও বিত্তশালীদের স্মরণ রাখা একান্ত উচিত যে, তাঁর কাছে যে সম্পদ আছে তা' সে নিজের ইচ্ছা বা শক্তিবলে ও কৌশলে পায়নি; বরং আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি দয়া করেই এ সব সম্পত্তি তাহার নিকট কিছুদিনের জন্য আমানত রেখেছেন। প্রয়োজনবোধে তাঁর নিকট হতে উক্ত আমানতী ধন অন্য কারো নিকট গচ্ছিত রাখবেন। অতএব আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-সম্পত্তিতে ধনী হয়ে উহা গরীব দুঃখীকে দান করার পর অহমিকা ও আনন্দ লাভ করার কোন যুক্তি নেই। আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য দান-খয়রাত করবে। কুরআন পাকে প্রকৃত-পক্ষে দানশীল ব্যক্তিদের প্রশংসা উল্লেখ করা হয়েছে। "তারা একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য গরীব-দুঃখী, য়াতীম ও কয়েদীকে আহার দান করে থাকে; আর তারা (স্পষ্টই) বলে—তোমাদের নিকট হতে কোন প্রকার বদলা বা প্রতিদানের আশা করিনা।" (৭৬ঃ ৮)

দানের প্রতিদান হিসাবে দীন-দুঃখী ও অভাবগ্রস্তদের নিকট হ'তে কোন প্রকার সম্মান বা উপকার গ্রহণ করা হারাম; এমনকি মনে মনে

কল্পনা করাও জায়েয নহে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন পাওয়ার উদ্দেশ্যে দান করে সে পরকালে এ সব দানের কোন মূল্য আল্লাহ্‌র নিকট হতে পাবেনা। (২ঃ ২৬৪)

এ পর্যন্ত যথা সম্ভব আর্থিক সাহায্য দ্বারা মানবতার সেবা করার ব্যাপারে যৎসামান্য আলোকপাত করা হল। কিন্তু আর্থিক সাহায্য ছাড়াও মৌখিক সাহায্য, দৈহিক সাহায্য এমনকি আন্তরিক সাহায্য দ্বারাও মানবতার ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য কুরআনের নির্দেশ রয়েছে। এর জন্য বিশ্ববাসীর নিকট সর্বকালের জন্য এ মহাগ্রন্থ এক অমূল্য সম্পদ হিসাবে বিদ্যমান থাকবে।—"মানুষের সাথে সুন্দরভাবে আলাপ কর।" (৪২ঃ ৮৩)

—"ভাল কথা (বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট সান্ত্বনার বাণী) দান-খয়রাত হতে উত্তম।" (২ঃ ২৬২)

এমনকি মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে হিদায়তের উদ্দেশ্যে ডাকার সময় আল্লাহ্‌র নির্দেশ অতি সুন্দর ও উদ্দেশ্যপূর্ণ।

--"হে নবী আপনি মানুষকে আপনার প্রভুর পথের দিকে আহ্বান করুন সুকৌশল ও উত্তম আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে।"—আল্-কুরআন।

কেহ কোন রোগীকে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে দেখতে গেলে আল্লাহ্ পাক ৭০ বছরের নফল ইবাদতের নেকী তার আমলনামায় সংযোজন করেন।

কী মহান ইসলাম আর তার বিধান পবিত্র কুরআন। একজন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলে কিরূপ মূল্য লাভের ব্যবস্থা রয়েছে ইসলামে। বস্তুত এসবের মাধ্যমে মানুষকে মানবতার সেবায় সীমাহীন উৎসাহ ও প্রেরণা দান করা হয়েছে।

শ্রমিকশ্রেণী সাধারণত তাদের মালিকের সাথে বিদ্যা-বুদ্ধি, ধনে-জনে সমতুল্য নাও হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সাথে মানবতা-সুলভ উত্তম ব্যবহার করার জন্য ইসলামের বিধান রয়েছে। শ্রমিকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য নবীজী বলেছেনঃ "শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার মজুরি দিয়ে দাও।"

"তোমাদের খাদেম বা চাকর-বাকর তোমাদেরই ভাই; আল্লাহ্-পাক তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তার ভাইকে তার অধীনে রাখবে এও তার দায়িত্ব হবে যে, সে যা আহার করবে খাদেমকেও তাই দিবে; আর সে যা পরিধান করবে চাকরকেও ঠিক তদনুরূপ পোশাক দিতে হবে।"--আল-হাদীস।

পবিত্র কুরআনে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি কত দরদ দেখানো হয়েছে নিম্নের হাদীসটি তার যথার্থ প্রমাণ বহন করছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুরে আকরাম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির নিকট তার কোন মুসলমান ভাই কোন প্রকার কৈফিয়ত নিয়ে আসে আর সে তা গ্রহণ করেনা, সেই ব্যক্তি আমার হাউজে কাওসারের ধারে কাছেও আসতে পারবে না।

—"তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হ'ল ঐ ব্যক্তি যে লোকের উপকার করে।"--আল-হাদীস।

মানুষের নেতৃত্বদানে আল্ কুরআনের ভূমিকা

মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, মানবজাতির সার্বজনীন ও কল্যাণকর কিতাব। ইহা পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। পৃথিবী প্রলয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইহা মানব সমাজে বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ্‌পাক নিজেই আল্ কুরআনের হিফাযত করবেন বলে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। এ পবিত্র গ্রন্থ নাযিল হওয়ার পূর্বে মানব জাতির চরিত্রে সকল প্রকার মানবিক গুণাবলীর সমাবেশ ছিল না। খাদ্য-দ্রব্য ভক্ষণের ব্যাপারে, আচার-ব্যবহার এবং উন্নত জীবন যাপন করার বিষয়ে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান ছিল। কুরআনের ধারক ও বাহক জাতির চরিত্র সংশোধন করে তাদেরকে নেতৃত্বদানের যোগ্য করে গড়ে তোলার কথা আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন :

"তোমরাই আমার শ্রেষ্ঠ উম্মত (নেতৃত্বদানের জন্য)। মানুষের চরিত্রকে সংশোধন করার জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে যেন তোমরা সৎকার্যে আদেশ দিতে পার এবং অসৎকার্যে নিষেধ করতে পার।" (৩ : ১১০)

আল্ কুরআনে সে জন্যই আদর্শ ও চরিত্রবান নাগরিকের গুণাবলীসহ নেতা নির্বাচনের জন্য শিক্ষা দান করা হয়েছে। একজন আদর্শ নেতার পক্ষে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সকল প্রকার সমস্যার সুষ্ঠু ও যথাযথ সমাধান দেয়া সম্ভব। প্রিয় নবীজী আল্ কুরআনের প্রদত্ত নেতৃত্বের সকল গুণাবলী আয়ত্ত করেছিলেন বলেই হিজরতের পর পবিত্র মদীনায় তিনি একটা নতুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হলেন। মানব জাতির মধ্যে নেতৃত্বের মাপকাঠি সম্বন্ধে কুরআনে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যা সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য।

বিশ্ব-আলোড়ন সৃষ্টিকারী আল্ কিতাব মানব চরিত্রের উন্নতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। চরিত্রের উন্নতির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত নেতাকে মেনে চলা, তাঁকে অনুসরণ-অনুকরণ করা। সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে আদর্শ নেতাকে মেনে চলা কত যে প্রয়োজন তা বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। সমাজ জীবনে সাধারণ লোকে নেতার গুণকে বাস্তবভাবে দেখতে পায় এবং সহজেই তাদের আচার ব্যবহার পরিবর্তন করতে পারে। সেজন্য পবিত্র কুরআনে নেতা মনোনয়ন বা নির্বাচনের মাপকাঠি সুস্পষ্টভাবে দেয়া হয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হল।

(ক) কুরআনের মতে, নেতৃত্ব কাহারও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নয়। এমনকি আসমানী নির্দেশ, অনুগ্রহ ও সমর্থনের সুযোগ লাভ করেও নেতৃত্বের দাবী করা চলেনা। একমাত্র আপন উন্নত চরিত্রের মাধ্যমেই নেতৃত্বের মর্যাদার অধিকারী হওয়া সম্ভব। এ প্রসঙ্গে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। বারবার চরিত্রের অগ্নি পরীক্ষায় পাশ করার পর আল্লাহ্ যখন তাঁকে নেতৃত্ব দান করলেন, তখন তিনি নিজ বংশধর হতে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দান করার প্রার্থনা করলেন। জবাবে আল্লাহ্ পাক একান্ত প্রিয় নবীর আবদারকে মঞ্জুর করলেন না। কারণ, যদি তাঁর বংশধরগণ জালিম হয় ও নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন না করে তা' হলে তারা সমাজের নেতা হতে পারবে না এবং মানুষের কষ্ট হবে। (২ঃ ১২৪)

(খ) কুরআনের দৃষ্টিতে নেতার পরিচয়, বংশ, গোত্র, দৈহিক সৌন্দর্য ইত্যাদি কিছু রাখা হয়নি। সততা ও ন্যায়-পরায়ণতাই নেতা হওয়ার শর্ত। নবীজী বলেছেন ঃ

"যদি কুৎসিত হাবশীও তোমাদের নেতা হয় এবং তিনি আল্লাহ্র ও রসূল (সঃ)-এর নির্দেশ মুতাবিক তোমাদেরকে পরিচালনা করেন, তা' হলে তোমরা বিনা দ্বিধায় তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেবে।"

(গ) কুরআনের নির্দেশগত নেতাকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, উদার ও মহৎ হতে হবে। নীচতা, হীনতা ও স্বার্থপরতা ইত্যাদির উর্ধ্বে থাকতে হবে। মহান নবীর একান্ত শত্রুকেও তিনি হাতে পেয়ে ক্ষমা করেছেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনসহ অগণিত দেশবাসীকে বিনা শর্তে ও বিনা কটুবাক্যে হাসিমুখে মুক্তি দিয়েছেন। অথচ ইতিহাস জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে, মক্কাবাসীর চরম অত্যাচার হতে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তিনি মদীনায় হিজরত করেছিলেন। ক্ষমা মহৎ গুণ; যত আগে তত ভাল,—কুরআনের শিক্ষা। বিশ্ববাসী এ শিক্ষাকে গ্রহণ করলে দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হত।

(ঘ) নেতাকে লোভ-লালসা ও হিংসা-বিদ্বেষ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে। মানব সমাজের নেতাকে আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হতে হবে। আল্লাহ্ যেমন বিশ্বের প্রতিপালক,—প্রাণীজগতমাত্রই তাঁর প্রদত্ত রিজিক গ্রহণ করে জীবন ধারণ করে। রাষ্ট্রীয় জীবনেও নেতাকে ধনী-গরীব, পাপী-নিষ্পাপ; আত্মীয়-অনাত্মীয়, ছোট-বড় এমনকি আস্তিক-নাস্তিক—সমভাবে সকলের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। তাঁকে সকলের প্রতি সেবার হাত সমভাবে প্রসারিত করতে হবে। নবীজী স্পষ্টই বলেছেন,

"যিনি তোমাদের সেবক হবেন তিনিই হবেন তোমাদের নেতা।"

নবীজী সেবার আদর্শ কেবলমাত্র তাঁর অনুগামীদের প্রতি দেখান নি; অমুসলিমগণও তাঁর সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন।

(ঙ) নেতার সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব ও গুণ হল, তিনি হবেন বাস্তববাদী ও হাতে-কলমে শিক্ষাদাতা। ঘন্টার পর ঘন্টার বক্তৃতা দেয়া তাঁর কাজ নয়, উপদেশ দান করাই তাঁর দায়িত্ব নয়; বরং হাতে-কলমে ও বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি যা প্রমাণ করতে পারবেন, দেশের জন সাধারণ তা' গ্রহণ করতে বাধ্য,—আইন ও শৃঙ্খলা সুন্দরভাবে চলতে পারে। মিতব্যয়িতা, স্বহস্তে কাজ করা, যতটুকু সম্ভব দেশবাসীর প্রকৃত খোঁজ-খবর নিজে রাখা, রাষ্ট্রীয় কাজও নিজ দায়িত্বে রাখা ইত্যাদি শিক্ষা কুরআনেরই নির্দেশ। নবীজী অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেছেন।

(চ) জনগণের সাথে মেলামেশা ও নেতার কোন কাজকর্মে সন্দেহ হলে সরাসরি আলাপ আলোচনা করার সুযোগ দেয়ার মহান শিক্ষা পবিত্র কুরআনের ইঙ্গিত। ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছেন,

"যতক্ষণ আমি আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ)-এর নির্দেশমত আপনাদেরকে পরিচালনা করি ততক্ষণই আপনারা আমাকে অনুসরণ করবেন। এর ব্যতিক্রম ঘটলে আমাকে সংশোধন করে দেবেন। আমি সংশোধিত না হলে আপনারা আমাকে সহযোগিতা করবেন না।"

(ছ) অধিকাংশ দেশবাসীর সমর্থনে নেতাকে নির্বাচিত হতে হবে। ছলে-বলে-কলে-কৌশলে নেতৃত্ব লাভ করার প্রতি কুরআনে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। 'গায়ে মানেনা আপনি মোড়ল' ব্যবস্থা কুরআনের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অন্যায়।

'রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট'—এ কথা চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝাবার প্রয়োজন নেই। আমাদের সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা ও রিজিকদাতা আল্লাহ্ পাক এ জন্যই তাঁর বান্দাদের উপর যারা নেতৃত্ব দান করবেন তাদের কার্য-কলাপ ও চাল-চলনের রূপরেখা, পবিত্র কুরআন ও মহানবীর জীবনাদর্শের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আজ আমরা সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়েছি প্রকৃত কুরআন নির্দেশিত নেতৃত্বের অভাবে।

নারী সমাজের মর্যাদাদানে কুরআনের নির্দেশ

আল্লাহ্ পাক মানব জাতিকে দু'টি পৃথক শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন—নর ও নারী। উভয় শ্রেণীর মধ্যদিয়ে মানব জাতির সত্যিকারের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। কিন্তু শক্তি, সাহস, ধৈর্য, শৌর্য, কঠোরতা, কর্মদক্ষতা ইত্যাদি গুণের সমাবেশ পুরুষ জাতির মধ্যে অধিক পরিমাণে নিহিত। কমনীয়তা, সৌন্দর্য, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, সেবা-মনোবৃত্তি, অল্পে তুষ্টি ইত্যাদি গুণ তুলনামূলকভাবে নারী জাতির মধ্যে অধিক পরিমাণে বিরাজমান। নারী জাতির দৈহিক দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে পুরুষ জাতি কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নারী জাতিকে ভোগ বিলাসের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করত। এমন কি পুরুষের কামভাব চরিতার্থ করার পর তাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করত।

পবিত্র কুরআন নারী জাতিকে এ চরম অবহেলিত ও অপমানিত অবস্থা হতে নিষ্কৃতির বাণী শুনিয়েছে। সমাজে নারীর মান-মর্যাদা ও অধিকারের কথা ঘোষণা করেছে। বিশ্ববাসীও নারী জাতির সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নারী-পুরুষের সমবেত প্রচেষ্টা ছাড়া কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। আর সেজন্য পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

"নারীগণ পুরুষের পোশাকস্বরূপ এবং পুরুষগণও নারীদের পোশাক স্বরূপ। (২ঃ ১৮৭)

অর্থাৎ পোশাক পরিচ্ছদ ছাড়া যেমন সমাজ জীবনে বসবাস করা ও মান-সম্মান বজায় রাখা সম্ভব নয়, তেমনি নারী জাতি পুরুষের সাথে বসবাস না করলে এবং পুরুষ জাতিও নারী জাতির সাথে বৈধভাবে সহঅবস্থান না করলে ব্যক্তি জীবন তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখী ও সমৃদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। উভয়ের বৈধ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহ-অবস্থান দ্বারাই সমাজ-জীবন সুখী ও সার্থক হয়ে থাকে।

নারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পবিত্র কুরআনের পূর্ণ একটি অধ্যায়—সূরা 'নিসা' অবতীর্ণ হয়েছে। এ অধ্যায়ে নারী সমাজের দৈনন্দিন জীবনধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সৎ জীবন যাপনের

জন্য ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া এবং মরিয়ম বিনতে ইমরানের প্রশংসা করা হয়েছে। কুরআন পাকে বিবি হাওয়ার পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ, কেহ কেহ মনে করত বেহেস্তে বিবি হাওয়া হযরত আদম (আঃ)-কে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার জন্য প্ররোচনা করেছিলেন। ফলে হযরত আদম (আঃ) নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করেন। এবং এ জন্য বেহেস্ত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে তাঁরা পৃথিবীতে আগমন করেন। তেমনি-ভাবে বিবি মরিয়মের পবিত্রতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, হযরত আদম (আঃ)-কে যেমন পিতামাতা ব্যতীত মাটি থেকে আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেছেন, তদ্রূপ হযরত ঈসা (আঃ)-কে পিতৃহীন অবস্থায় শুধু মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ করেছেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ব্যাপারে কোন পুরুষ জাতি বিবি মরিয়মকে স্পর্শ করেনি। আল্লাহ্ পাক তাঁর সৃষ্টির অপূর্ব শক্তি প্রকাশ করার জন্য এ ব্যবস্থা করেছেন। বস্তুত পিতৃহীন অবস্থায় মানুষের জন্মদান করা আল্লাহ্‌র জন্য অতি সহজ ব্যাপার—এ রহস্য প্রকাশের জন্যই তিনি এ ব্যবস্থা করেছেন। পবিত্র কুরআনে মরিয়মের বংশগত, জন্মগত পবিত্রতা এবং তাঁর জীবনের সততা পূর্ণমাত্রায় বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে নারী জাতির মর্যাদা, অধিকার, পবিত্রতা ইত্যাদি কুরআনের একাধিক স্থানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ প্রাক ইসলামী যুগে পৃথিবীর সর্বত্র নারী জাতিকে অস্থাবর সম্পত্তি বলে মনে করা হত। পুরুষের নিকট বা সমাজে তাদের কোনই মর্যাদা ছিল না, তাদের কোনই অধিকার ছিল না। এতদ্ব্যতীত পবিত্র কুরআনের ২৮ পারায় আউস বিনতে সমিতের স্ত্রী খাওলা ও ও রাণী বিলকিসের ঘটনা বর্ণনা নারী জাতির প্রতি কুরআনের তথা ইসলামের সুমহান নীতির অভিব্যক্তি, তাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী জাতি পৈত্রিক সম্পত্তি হতে বঞ্চিত ছিল। এমনকি স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের কোন অধিকার ছিল না। সে যুগে নারী জাতি শুধু পুরুষের করুণার উপরই নির্ভরশীল ছিল। একমাত্র আল্-কুরআন নারী জাতির এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। পিতার সম্পত্তিতে, স্বামীর সম্পত্তিতে, এবং পুত্রের সম্পত্তিতে তাদের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে। উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পত্তিতে অংশ নির্ধারণ করে পবিত্র কুরআন নারী জাতির ইজ্জত-আবরু ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্য স্থায়ী সমাধান দিয়েছে।

বিবাহিত জীবনেও নারী জাতিকে যেন অপরিচিত স্বামীর নিকট গিয়ে নতুন পরিবেশে ও নতুন অবস্থায় ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা খর্ব না করতে

হয় তার জন্য বিবাহের সময় স্বামীর উপর দেন মোহর ধার্য করা হয়েছে। এ মোহর স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মানব সমাজে নারী জাতির মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। মোহর নির্ধারণ ও আদায় করা ছাড়া বিবাহ বৈধ হয় না।

দাম্পত্য জীবনে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মুকাবিলা করতে হয়। এমতাবস্থায় যদি দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রীর জীবনাদর্শে ও মতে মিল হয়না, তখন উভয়েরই জীবনের দুঃখ ও জ্বালা পোহাবার প্রয়োজন নেই। আপোষে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানোর স্বাধীনতা কুরআন পাকে রয়েছে। বিশেষ জরুরী ও একান্ত প্রয়োজনের তাকিদে ইসলাম এ চরম ব্যবস্থা গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর স্বাধীনতা ও মান-মর্যাদাকে স্বীকার করেছে। তালাকের ন্যায় চরম ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে অবশ্য স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-বিবাদ মিটাবার বিবিধ পন্থা অবলম্বন করার জন্য কুরআনের নির্দেশ ও উপদেশ আছে। তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদ বৈধ উপায়ে নিকৃষ্টতম ব্যবস্থা। কুরআনের মর্মবাণীতে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আল্লাহ্ পাক স্বামী-স্ত্রীর সুখ-শান্তি কামনা করেন এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ বা তালাককে দীর্ঘ-সূত্রিতা বা নানা শর্তসাপেক্ষের স্থান দিয়েছে। তালাক দেয়ার পরপরই পুরুষের দায়িত্ব শেষ হয়না বরং তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীকে কমপক্ষে তিন মাস দশ দিন পর্যন্ত ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে দিতে হয়। এ সময়ের মধ্যে উক্ত মহিলার আত্মীয়-স্বজনরা তার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা বিধি ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। পবিত্র কুরআনে এ ভরণ-পোষণের বিধান মানবতার কাজ এবং স্ত্রীর মান মর্যাদা রক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য কুরআনের নির্দেশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট।
(৪ : ১৯)

খাওয়া-পরার ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন বৈষম্য থাকবে না। এমনকি স্ত্রীকে প্রহার করবার মত অবস্থা সৃষ্টি হলেও তার মুখমণ্ডলে প্রহার না করার জন্য কুরআনী নির্দেশ রয়েছে। কারণ, এতে স্ত্রীর সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। বস্তুত পবিত্র কুরআনের এ নির্দেশ নারীর মর্যাদার প্রতি স্বীকৃতিরই স্বাক্ষর বহন করছে।

মাতা স্বীয় সন্তানকে দীর্ঘ দশ মাস পর্যন্ত গর্ভে ধারণ করেছেন এবং কষ্টের পর কষ্ট করেছেন—সেজন্য স্বীয় মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের প্রতি

কৃতজ্ঞ থাকার পর পরই মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ রয়েছে। এমনকি সন্তানের জন্য মাতা-পিতার পরকালের জীবন সুখী ও শান্তিপূর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করার কুর-আনী নির্দেশ রয়েছে। (১৭ : ২৪)

"মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্‌ত"—নবীজীর এ অমূল্য বাণী নারী জাতির মুক্তির মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ট নয় কি ?

পবিত্র কুরআনে নারী জাতিকে স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী হিসেবে এবং আদর্শ নাগরিকের সম্মানিতা মাতা হিসেবে মানব সমাজে স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। এ-ই হল নারী জাতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সারকথা।

আল্ কুরআন বিশ্ব শান্তির রক্ষা-কবচ

আল্লাহ্ তা'আলা এ পৃথিবী ও উহার মধ্যস্থ সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অন্যভাবে বলা যায়, মানব জাতি সৃষ্টি করা আল্লাহ্ তা'আলার মূল লক্ষ্য এবং পৃথিবীসহ অন্য সব সৃষ্টি উপলক্ষ মাত্র। তবে পৃথিবী মানুষের চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা নয়। এখানে মানুষের বসবাস সম্পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী। তাকে অনন্তকাল বসবাস করতে হবে পরলোকে। এখান হতেই মানুষকে পরকালে সুখ-শান্তিতে বসবাস করার পাথেয় সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হবে। এ কথার প্রতি ইংগিত করেই মহানবী (সঃ) বলেছেন, "পৃথিবী পরকালের শস্যক্ষেত্র।"—এ পৃথিবীতে যারা ভাল কাজ করবে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল (সঃ)-এর নির্দেশিত পথে চলবে, পরকালে তারা এর প্রতিফল লাভ করবে। ব্যতিক্রম করলে, আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ পথে চললে পরকালে ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। পরকাল তো অনেক পরের কথা, ইহকালেও মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, তথা চলমান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চরম অশান্তি ও বিশৃংখলা নেমে আসবে। ইহকালেও মানুষ যাতে শান্তিশৃংখলার সাথে বসবাস করতে পারে, মানুষ তাকে সৃষ্টি করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মানুষের সামনে একটা রূপরেখা তুলে ধরেছেন। এ রূপরেখায় রয়েছে কতকগুলি বিধিনিষেধ। এসব বিধি-নিষেধ মেনে চললে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনই কল্যাণ ও শান্তিময় হবে। সমগ্র বিশ্ব আজ যে অশান্তির বহ্নিশিখায় জ্বলছে মানুষ পবিত্র কুরআনকে তাদের জীবন পথের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করলে কবেই না পৃথিবী হতে সকল প্রকার অশান্তি চিরতরে দূর হয়ে যেত। বস্তুত আল কুরআন হল বিশ্বশান্তির একমাত্র রক্ষাকবচ। এখানে কয়েকটি বিষয়ে পবিত্র কুরআনের কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হল।

হত্যাকান্ড সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—"আর যে কেউ কোন মু'মিনকে স্বেচ্ছায় হত্যা করবে, তার শাস্তি হল জাহান্নাম। সেখানেই তাকে চিরকাল থাকতে হবে। আল্লাহ্ পাক তাঁর উপর ক্রোধান্বিত হবেন এবং তাঁর অভিশাপ পতিত হবে। আর তার জন্যে ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থাও রয়েছে। (৪ : ৯৩)

সমাজে হত্যাকান্ডের মত জঘন্য অপরাধ আর কিছুই নেই। নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মরিয়া

হয়ে উঠে। একটি হত্যাকাণ্ড একাধিক হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এরূপে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, সামাজিক পরিবেশ বিষময় হয়ে উঠে। আর তাই পবিত্র কুরআনে এর বিরুদ্ধে কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে। অবশ্য যদি কেহ অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে, সে সম্পর্কেও পবিত্র কুরআনের নির্দেশ রয়েছে। বলা হয়েছে ? "কোন মুমিন লোকের পক্ষে শোভা পায়না যে, সে অন্য একজন মুমিনকে হত্যা করবে। তবে ভুলের কথা আলাদা। যে কেহ ভুলবশত কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার উচিত একটা মুসলিম দাসকে মুক্ত করে দেয়া, তার ক্ষতিপূরণ আদায় করা, যা তার (নিহতের) পরিবার পরিজনদের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে হবে। তবে তারা যদি ক্ষমা করে দেয় সে কথা আলাদা। আর নিহত ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয়,—কিন্তু সে নিজে মুমিন ছিল, তা হলে মুসলিম গোলাম মুক্তি দিতে হবে। নিহত ব্যক্তি যদি এমন কোন কওমের লোক হয়, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে, তবে নিহত ব্যক্তির পরিবার পরিজনদের নিকট ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওনা পৌঁছিয়ে দিতে হবে; আর একটা মুসলিম গোলাম মুক্তি দিতে হবে। আর যদি কেহ তা করতে অক্ষম হয় তা হলে ধারাবাহিক দুই মাস রোযা রাখবে। তওবার এ বিধানটি আল্লাহর তরফ হতে নির্ধারিত হল। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও পরম কুশলী।" —পবিত্র কুরআনের এ বাণীটি সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের পক্ষে এত সুস্পষ্ট যে, তা আর উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির একটা প্রধান কারণ হল আত্মসাৎ। ইহা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হতে পারে, আবার সামাজিক, পারিবারিক কিংবা ব্যক্তি পর্যায়েও হতে পারে। পবিত্র কুরআনে এ থেকে বিরত থাকার জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছেঃ "তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করোনা" (২ঃ১৮৮)। য়াতীমদের ধন সম্পদ আত্মসাতের ব্যাপারে তো আরো কঠোর ভাষায় বারণ করা হয়েছেঃ

"যারা অন্যায়ভাবে য়াতীমদের বিষয়-সম্পদ আত্মসাৎ করে তারা নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করছে। তারা শীঘ্রই আগুনের মধ্যে ঢুকতে বাধ্য থাকবে।" (৪ঃ১০)

সমাজদেহের আর একটি দুষ্ট ব্যাধি চৌর্যবৃত্তি। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "যে কেহ চুরি করবে, সে পুরুষ কিংবা নারী হোক, তোমরা তাদের হাত দুটো কেটে দাও। এ হল তাদের কর্মফল, এবং আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও পরম কুশলী। (৫ঃ৩৮)

পবিত্র কুরআনে চুরির এরূপ কঠিন শাস্তি বিধানের তাৎপর্য হল, সমাজে মানুষ সহজে চোরকে চিনতে পারবে, এবং তার সম্পর্কে সতর্ক হবে। অপরদিকে, চোরও হাত কাটার মত কঠোর শাস্তি ও লোক লজ্জার ভয়ে চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে। পবিত্র কুরআনের এ বিধানকে অনেকে অমানবিক বলে সমালোচনা করে থাকেন। কিন্তু একথা কারো অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এ বিধান আজও যে সব মুসলিম রাষ্ট্রে কার্যকর রয়েছে, সেখানে চৌর্যবৃত্তি নেই বললে অত্যুক্তি করা হবে না। সুতরাং এসম্পর্কে সমালোচনার অর্থ চৌর্যবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

ব্যক্তি, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনকে যে সকল দুর্নীতি বা দুষ্কর্ম কলুষিত করে, স্বাভাবিকতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে, ঘুষ তন্মধ্যে অন্যতম। কর্তব্যে ফাঁকি দিয়ে, ন্যায়-বিচার ও বিবেককে ফাঁকি দিয়ে, ত্রাস সৃষ্টি করে এবং একজনের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করে অপরজনকে উপকৃত করার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করার নামই ঘুষ। এ ঘুষ আজ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় কিরূপ অশান্তির সৃষ্টি করছে তা আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এর বিষময় প্রতিক্রিয়া। ঘুষ প্রদান ও গ্রহণ ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

তারা তাদের পেটে অগ্নি ছাড়া আর কিছুই পুরছেনা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের মুক্তি দেবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে ন্যায্য ভয়াবহ শাস্তি। (২ ঃ ১৭৪)

শোষণ ও নির্যাতনের আর একটা মারাত্মক হাতিয়ার হল সুদ প্রথা। সুদ গ্রহণকারীর হৃদয় নির্মম ও কঠোর হয়ে থাকে। মায়া-মমতা ও প্রেম-প্রীতি বলতে তার অন্তরে কিছুই থাকেনা। অর্থলিপ্সা, স্বার্থপরতা, কপটতা ও কুটিলতাই তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। সুদের মাধ্যমে সমাজের বিত্তহীনদের রক্ত শোষিত হয়ে বিত্তবানদের ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ হয়। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ও ঘৃণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরূপে সামাজিক শান্তি চরমরূপে ব্যাহত হয়। সুতরাং সামাজিক শান্তি বিনষ্টকারী যে কোন বিষয় ইসলাম সমর্থন করতে পারে না। আর তাই পবিত্র কুরআনে সুদপ্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরকালে এর চরম পরিণতি সম্পর্কে মানব জাতিকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন ঃ

"শয়তান কাউকেও জাপটিয়ে ধরলে যেরূপ দিশাহারা হয়, সুদ-খোররা কিয়ামতের দিন ঠিক তেমনি অবস্থায় উঠবে। তাদের এ দুর্দশার কারণ তারা বলত, ব্যবসায় তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ্ ব্যবসায়কে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। (২ঃ২৭৫)

মজুতদারী, কালোবাজারী ও চোরাচালান ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানকল্পে সমাজদেহ থেকে এসব নির্মূল করতে হবে। মজুতদারীর চরম পরিণতির সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

—"যারা সোনা-রূপা, (ধন-সম্পদ) জমা করে, কিন্তু তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করেনা; (হে রসূল,) আপনি তাদেকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির কথা জানিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে সেসব গরম করে তাদের কপাল, পাঁজর আর পিঠে দাগ দেয়া হবে।" (৯ঃ৩৪-৩৫)

মহানবী (সঃ) বলেছেন, "চল্লিশ দিনের বেশী খাদ্য দ্রব্য মজুত রাখা হারাম।"

সম্পাদিত চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা মানুষমাত্রেরই অবশ্য-কর্তব্য। এ চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ব্যক্তিগত, সামাজিক, এমনকি আন্তঃরাষ্ট্রিকও হতে পারে। চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ অনেক সময় মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। অতীতে পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সব যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে, অধিকাংশগুলোর পেছনে চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ইন্ধন জুগিয়েছে। এ জন্য বিশ্ব শান্তির নিয়ামক পবিত্র কুরআনে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার তাকিদ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে পরকালে জবাব-দিহির কথা ঘোষণা করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,—"হে ঈমানদার-গণ, তোমরা নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূরণ কর।" (৫ঃ১)

—"তোমরা নিজেদের ওয়াদা পূরণ কর। নিশ্চয়ই ওয়াদার ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।" (১৭ঃ৩৪)

ইনসাফ বা ন্যায়-নীতি অবলম্বনের জন্য পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে বলা হয়েছে। মূলত ন্যায়-নীতিই হল মানব সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলার মূল চাবি-কাঠি। প্রতিটি মানুষ যদি ন্যায় পথে চলে, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে তবে কোন দিনই সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হবে না। হতে পারে না। আর তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

"তোমরা সবাই ন্যায় বিচারের উপর কায়েম থাকবে—আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে। হোক না তা নিজেদের ব্যাপারে কিংবা মা-বাবা

অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে, চাই সে গরীব কিংবা ধনী হোক, তাদের দুজনের সাথে আল্লাহ্‌র যোগ-সম্পর্কইত সবচেয়ে বেশী। তোমরা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুগত হবে না, তাতে তোমরা ন্যায়-বিচার হতে দূরে সরে পড়বে। তোমরা যদি বিকৃত বিবরন দাও কিংবা এড়িয়ে যাও তাহলে জানবে আল্লাহ্ সে সবের খবর রাখেন তোমরা যা কিছু করছ।" (৪ : ১৩৫)

"তোমরা যারা ঈমান এনেছ, শোন! তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র নামে সত্য সঠিক সাক্ষ্য দানে তৎপর হও। আর কোনও কওমের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে. সুবিচার করবে। কারণ, ইহা তাকওয়ার সাথে খুবই ঘনিষ্ট। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ বেশ জানেন।" (৫ : ৮)

পবিত্র কুরআনে মদ্যপান, জুয়া, ব্যাভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা, স্বজন-প্রীতি তথা প্রতিটি সমাজবিরোধী কার্য-কলাপ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অনুরূপ যে সব কাজ বা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানব জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সব সম্পর্কেও বিধি-বিধান ও আদেশ-উপদেশ রয়েছে। আজকের ঝঞ্চাবিক্ষুব্ধ বিশ্বে পবিত্র কুরআনের এ সব বিধি-নিষেধ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই একমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। আর তাই আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, আল্ কুরআনই বিশ্ব শান্তির একমাত্র রক্ষা কবচ।

জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার—আল্ কুরআন

মানুষের জীবন সীমাবদ্ধ, কাজেই সীমাবদ্ধ জীবনে মানুষের জ্ঞানের পরিধি আর কত বৃদ্ধি পাবে !

"তোমাদিগকে কেবলমাত্র সামান্য পরিমাণে জ্ঞান দান করা হয়েছে।" আল্লাহ্ পাকের জ্ঞান-ভাণ্ডার অসীম, আমাদের পক্ষে তাঁর জ্ঞানের পরিধি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সেজন্য তিনি মানব জাতির নিকট এমন এক মহাগ্রন্থ পাঠালেন, যে গ্রন্থে বহুমুখী অফুরন্ত জ্ঞানের খনি বিরাজমান। সর্বযুগের মানুষ এই মহাগ্রন্থ হতে ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, ইহলৌকিক, ও পারলৌকিক, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে। এসব বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বলে, যে যত গবেষণা করবে, তার জ্ঞানের পরিধি তত বৃদ্ধি পাবে।

মোট কথা, মানুষের চিন্তার খোরাক ও গবেষণার বিষয়বস্তু এ অমূল্য গ্রন্থে বিদ্যমান। "তোমরা কি আকাশের দিকে নজর দিয়েছ? কিভাবে আমি আকাশ সৃষ্টি করেছি কিংবা উহাকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছি এবং এতে কোন ছিদ্র বা ফাঁক হয় নি। (৫০ : ৬)

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে সৌর জগত সম্বন্ধে চিন্তাশক্তি কাজে লাগাবার জন্য কি সুন্দর প্রেরণা দান করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এভাবে জ্ঞান-বিষয়ক ও চিন্তামূলক বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে মানুষের স্বচ্ছ ও স্বাধীন চিন্তা শক্তি ও বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগাবার জন্যে। কারণ, কুরআন অবতীর্ণ হবার পূর্বে খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী বিশ্ব ইতিহাসের এক চরম অন্ধকার যুগ। তখন মানবীয় গুণাবলী ও মানবসুলভ সৌন্দর্য-সৌকর্য ছিল একেবারেই লাঞ্ছিত ও পদদলিত। মানুষ তার সৃষ্টিকর্তাকেই ভুলে গিয়েছিল। কুরআন হাদীসে তাই সর্বপ্রথম খোদার খোদায়ী ও তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা পেশ করে সে গলদ ও বাতিল-বিশ্বাসকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সঃ) কে বলা হয়েছে ঃ

"পড়, তোমার সৃষ্টিকর্তার নামে, যিনি জমাট রক্ত দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পড়, এবং তোমার প্রভু বড়ই মহীয়ান, যিনি জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন কলমের মাধ্যমে। মানুষকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যা সে আগে জানত না।" (৯৬ : ১—৩)

সে অজ্ঞতা ও বর্বরতার যুগে তাওহীদের শিক্ষা বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করার মত কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ মানুষের চেষ্টা তদবীর দ্বারা মোটেও সম্ভব হতনা। কিন্তু একমাত্র কুরআনই বিশ্ববাসীর সামনে অকাট্য যুক্তির সাহায্যে এমন অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডারসহ হাজির হল যা দেখে সকলেই মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে।

মহাগ্রন্থ কুরআন মানব জাতিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন জ্ঞানের বেড়াজাল ধ্বংস করে প্রকৃত জ্ঞানের বলে বলীয়ান হবার জন্য আহবান জানিয়েছে।

"এ আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল, দিন ও রাত্রের পরিবর্তন মানব-মণ্ডলীর সমুদ্রে চালানো জাহাজসমূহ, বৃষ্টিপাতের ব্যাপার, এবং বৃষ্টিপাতের দ্বারা মৃত (অর্থাৎ শুষ্ক) জমীনকে জীবিত (শস্য-শ্যামল) করা, জীব-জন্তুকে পৃথিবীর বুকে বিক্ষিপ্ত করে রাখার ব্যাপার, বায়ু-রাশির গতি পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে বিনা অবলম্বনে মেঘমালাকে আটকিয়ে রাখা ইত্যাদি ব্যাপারে জ্ঞানীদের জন্য নিহিত রয়েছে আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন ও কুদরত।" (২ঃ ১৬৪)

কুরআন পাকে মানব সমাজের জন্য বাস্তবমুখী দৃষ্টান্তই বেশী করে পেশ করা হয়েছে যেন আমরা সহজেও স্পষ্টভাবে জ্ঞান শক্তিকে কাজে লাগাতে পারি। যেমন, নদ-নদী ও পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি-পাত করার জন্য বলা হয়েছে। চন্দ্র-সূর্য দুটি বাস্তবধর্মী উদাহরণ। সারা বিশ্বব্যাপী চন্দ্র-সূর্যের একটা পারস্পরিক ও সমঝোতার ব্যবস্থাপনা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্ব ও নিরংকুশ ক্ষমতা উপলব্ধি করার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর-আনে বলা হয়েছেঃ

"আর সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণ করে চলছে। ইহা মহা পরাক্রান্ত ও মহা-জ্ঞানীর অবধারিত বিধান আর চন্দ্রের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি কতকগুলি মনযিল। অবশেষে উহা হয়ে যায় খেজুর গাছের পুরাতন ডালের মত। না সূর্যের পক্ষে সম্ভব চন্দ্রের নাগাল পাওয়া আর না রাত্রের পক্ষে সম্ভব দিনকে অতিক্রম করা। বস্তুত প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে ভেসে বেড়াচ্ছে।"

তারপর—মানব জাতির সৃষ্টিগত কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা একান্ত জরুরী। আল্লাহ্ পাক তা প্রকাশ প্রসঙ্গে বলেছেন,ঃ

"যিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন সুন্দররূপে এবং মানব সৃষ্টির প্রথম সূচনা করেছেন কর্দম হতে। তারপর নিকৃষ্ট পানি হতে নিষ্কাশিত এক জীবন ধাতু হতে উৎপন্ন করলেন, আর তার নসল বা পরবর্তী বংশকে। অতঃপর যথাযথভাবে তার সংগঠন করলেন, আর তার মধ্যে স্থাপন করলেন জীবন বায়ু, ফুৎকার দিয়ে এবং যথাসময়ে তোমাদের

জন্য ব্যবস্থা করলেন কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয়ের। কিন্তু তোমরা খুব কম শোকর গোজারী করে থাক।" (৩২ : ৭–৯)

মানুষের জ্ঞান-অনুশীলনের জন্য কুরআনের প্রতিবেদনগুলি এত সুস্পষ্ট যে, একজন সাধারণ লোকেরও তা বুঝতে বা নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে যাচাই করতে কষ্ট হয় না। সে জন্য দেখা গিয়েছে পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার পর বেশী দিন যেতে না যেতেই মানুষ দলে দলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্ববাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল।

মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধির জন্য কুরআনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। সৃষ্টির আদি পিতা-হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির রহস্য হতে শুরু করে বেহেশ্‌ত হতে দুনিয়ায় প্রেরণের ঘটনা, হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনাবলী, হযরত লূত (আঃ), হযরত শুয়াইব (আঃ)-এর আল্লাহর একত্ববাদ প্রচারসহ বহু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) এবং ফিরআউনের খোদাই দাবীর পরিণতি ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর ইতিবৃত্ত, হযরত ইদরীস (আঃ)-কে আকাশে তুলে নিবার ঘটনা; নমরূদের সাথে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিতর্ক, হত্যার পরে পাখীদের আবার জীবিত করার ঘটনা ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর আত্মদানের ইতিবৃত্ত। হযরত ইউসুফ (আঃ) -এর কিস্সা, হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্ম লাভ, তাঁকে নীল নদীতে ভাসিয়ে দেয়া, তাঁর একজন কিবতীকে হত্যা করা, তাঁর মাদায়েন সফর ও মাদায়েনে বিবাহ করা, গাছের উপরে আগুনের শিখা দেখা, সে আগুন হতে কথা শুনতে পাওয়া, গাভী জবাই করার কিস্সা, মূসা (আঃ) ও হযরত খিজির (আঃ) এর সাক্ষাৎকার এবং তালুত ও জালুতের কাহিনী। তারপর বিলকিসের কিস্সা, জুল্‌কারনাইন, আসহাবে কাহাফের কিস্সা, পরস্পর কথোপকথনে লিপ্ত দুই ব্যক্তির কিস্সা, জান্নাতবাসী-দের বর্ণনা, হযরত ঈসা (আঃ)-এর শাহাদাত প্রাপ্ত, দূতদের কিস্সা।

শুধু মানুষকে শুনানোর জন্য এসব কিস্সা-কাহিনী বর্ণনা করা হয়নি বরং এগুলি বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য হ'ল শিরক্ ও মুশরিকের কিরূপ শোচনীয় পরিণতি দেখা দেয় এবং সেই সকলের জন্যে কিভাবে আল্লাহ্‌র গজব নাযিল হয়েছিল তার জ্ঞান ও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মানুষকে দেয়া। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যেন এ কথা বুঝতে পারে যে আল্লাহ্ পাক তার অনুগত খাঁটি বান্দাদের সর্বদা সহায়তা করে থাকেন।

মৃত্যু ও তার পরবর্তীকালীন ঘটনাবলী বর্ণনাও কুরআনে স্পষ্ট-ভাবে বিদ্যমান। মরণকালে মানুষ কিরূপ অসহায় হয়ে থাকে, মরণের

পরে—কখন বিচার হবে, কেমন করে বিচার হবে, বেহেশত কিম্বা দোযখে কারা যাবে আযাবের ফেরেশতারা কেমন করে এসে থাকে ইত্যাদির বর্ণনা। তা' ছাড়া কিয়ামতের নিদর্শন যথা হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকাশ হতে অবতরণ, দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীও স্থান পেয়েছে।

কিয়ামতের জন্য শিংগা কিভাবে ফুঁকা হবে, পুনরুত্থান ও পুনর্বিন্যাস কিভাবে ঘটবে, কিভাবে প্রশ্নোত্তর হবে, ইনসাফের পাল্লা কেমন করে স্থাপিত হবে এবং আমলনামা কি করে ডান ও বাম হাতে দেয়া হবে, মুমিনরা যে জান্নাত আর কাফিররা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাও পুনঃ পুনঃ বর্ণনা করা হয়েছে।

এমনকি, আযাবের জন্য নির্মিত আগুনের কড়া ও শিকল এবং আযাবের বিভিন্ন ধারা, যথা- হামীম, গাচ্ছাক, যাক্কুম ইত্যাদির বর্ণনা আছে। জান্নাতের বিবিধ নাজ নেয়ামত ও সুখ-শান্তির যথা—হুর, কসুর, দুধ, শরবতের নহর, উপাদেয় ও রুচিকর আহার্য, উত্তম ও আকর্শনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সুন্দরী নারীদের বর্ণনা রয়েছে।

এভাবে পবিত্র কুরআনে নানামুখী জ্ঞানের ভাণ্ডার স্থান পেয়েছে। যুগ যুগ ধরে এ মহা গ্রন্থখানি মানব সমাজে কালের আবর্তন ও রুচির দ্রুত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্যেও টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে। আজ সারা বিশ্বের সকল ভাষায় জ্ঞানের সীমাহীন ভাণ্ডারাদি সম্বন্ধে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আলোচনা ও গবেষণা চলছে। চৌদ্দশ' বছর পরও মানুষ এ মহান গ্রন্থে নতুন জ্ঞানের সন্ধান পেয়ে থাকে। আল্ কুরআন মানব ও বিশ্ব জীবন সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ মহাগ্রন্থ। ইহাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পেশ করা হয়েছে এবং দেওয়ানী ফৌজদারী আইন, বিবাহ, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনে যা' কিছু বিদ্যমান, তা মানব জীবনের জন্ম হ'তে মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়োজনীয়, শিক্ষাপ্রদ ও গবেষণাযোগ্য। সর্বকালের ও সর্ব জ্ঞানের ভাণ্ডার এই মহাগ্রন্থ, বিশ্বের জ্ঞানী-গুণী ও বৈজ্ঞানিকদের নিকট বিজ্ঞান পুস্তিকা, ভাষাবিদদের নিকট এক মহা শব্দকোষ, ব্যাকরণবেত্তার জন্য ব্যাকরণ গ্রন্থ, বিধি-বিধান প্রণয়নকারীদের জন্য এক চিরন্তন আইন পুস্তক, অর্থনীতিবিদদের জন্য অমর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপত্র, রাজনীতিবিদদের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ এবং ধর্মীয় নেতাদের নিকট অমূল্য সম্পদ হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এ মহা কিতাব নিয়ে যে কেহ গবেষণা করেছে সেই লাভবান হয়েছে, এমনকি ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রয়েছে।

আল্ কুরআনের দৃষ্টিতে অর্থনীতি

আমরা প্রথম হতেই বলে আসছি যে, কুরআন পাক একখানা স্বয়ং-সম্পূর্ণ মহাগ্রন্থ। এটা মানব জাতির ইহকাল ও পরকালের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আমাদের প্রতিপালক ও সৃষ্টিকর্তা নাযিল করেছেন। এ মহাগ্রন্থে আমাদের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ইহাতে আমাদের সকল সমস্যার সমাধান আমরা খুঁজে বের করতে পারি। জীবন ধারণের জন্য খাওয়া-পড়া, বেশ-ভূষা, ঘর-বাড়ী, আরাম-আয়েশ একান্ত জরুরী। এসব জিনিষ সংগ্রহ করার জন্য ধন-সম্পত্তির প্রয়োজন। কাজেই এ অমর গ্রন্থে ধন-সম্পত্তি উপার্জন করার ও ব্যয় করার যথাযথ আভাষ ও নির্দেশ রয়েছে। বিশেষ করে অর্থনীতির মৌলিক উপাদান-গুলি স্পষ্টভাবে দেখান হয়েছে। ইসলাম অর্থ উপার্জনের মাধ্যমসমূহ—যথা, ব্যবসা-বাণিজ্য, উত্তরাধিকার সূত্র, দান-খয়রাত, মযদুরী ও কৃষি-কার্য ইত্যাদি ন্যায়সংগত উপায়ে ধন-সম্পত্তি উপার্জন করার প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছে।

পবিত্র কুরআনে অর্থনীতির রূপ-রেখা নির্দেশ প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করেছে। অবশ্য ব্যক্তিমালিকানার ব্যাপারে কতকগুলি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন ঃ

"যদি আল্লাহ্ সকলের জন্য সমানভাবে জীবিকা বণ্টন করতেন তবে তারা পৃথিবীতে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকতো, কিন্তু তিনি তাদের প্রয়োজনমত রিজিকের ব্যবস্থা করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন ও দেখেন।" (৪২ ঃ ২৭) কুরআনী অর্থ-নীতির রূপরেখা উক্ত আয়াতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আল্লাহ্তা'আলা সকলকে সমানভাবে রিজিক বা ধন-সম্পত্তি দান করেন না। কারণ, সমান-ভাবে রিজিক পেলে কেউ কাউকে মানবে না। পৃথিবীতে ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি স্থায়ীভাবে লেগে থাকবে। তাছাড়া সকলের প্রয়োজনও সমান নহে। তিনি মানুষের প্রয়োজন ও প্রচেষ্টা অনুযায়ী রিজিকের ব্যবস্থা করে থাকেন। কেহ প্রয়োজনীয় রিজিক হতে বঞ্চিত হয়না। "প্রাণীজগতমাত্রই আল্লাহ্র রিজিকের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে।" —আল্ কুরআন।

ইসলাম ব্যক্তি-মালিকানাকে স্বীকার করেছে দু'টি মৌলিক নীতির উপর ঃ

(১) সম্পদ উৎপাদনের বেলায় কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের নিকট যেন সম্পত্তি জমা না হতে পারে।

(২) দ্বিতীয়ত, ধনীসম্প্রদায়ের অর্জিত ধন-সম্পত্তিতে দুঃখী ও অভাবী ব্যক্তিদের জন্য আইন-সঙ্গত উপায়ে একটি নির্দিষ্ট অংশ থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কুরআন মজীদ ঘোষণা করেছে—

"সাবধান ধন-সম্পত্তি যেন তোমাদের মধ্যে পুঞ্জিভূত হয়ে না পড়ে।"

"এবং তোমাদের অর্থসম্পদে দরিদ্র এবং গরীবদেরও অধিকার রয়েছে।"

"যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহুর নির্দেশিত পথে (অভাবীদের মধ্যে) খরচ না করে, তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা জানিয়ে দিন।"

মহানবী (সঃ) বলেছেনঃ ধনীদের নিকট হতে ধনসম্পদ নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।" ধনীদের ধন সম্পত্তির ৪০ ভাগের একভাগ গরীবদের জন্য দান করা ফরয করা হয়েছে এবং ৮২ বার কুরআন পাকে তা উল্লেখ করা হয়েছে। "পাড়া-প্রতিবেশী না খেয়ে কষ্ট পায় অথচ ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তি তাহা লক্ষ্য না করলে ঈমানদার ও মুসলমান বলে আল্লাহ্ ও রসুল (সঃ)-এর নিকট পরিচিত হবেনা।"—আল্-হাদীস

কুরআন মুসলমানদের নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ রৌপ্য অলংকার নগদ টাকা-পয়সা এবং তেজারতি মালের যাকাত বা ৪০ ভাগের একভাগ দরিদ্র ও অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করা ফরয করেছে। এ মহান ব্যবস্থার তাৎপর্য হল, বিত্তহীনদের জীবিকার সংস্থান করা এবং ধন-সম্পদ শ্রেণী-বিশেষের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে না দেয়া। কারণ, তাতে সমাজ-ব্যবস্থায় দুর্লংঘ অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে। আর ইসলাম কোন অবস্থায়ই এ অনুমোদন করেনা।

ইসলামে ব্যক্তিমালিকানাকে স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে ধন-সম্পত্তি স্তূপীকৃত না হবার জন্য যাকাত ছাড়াও বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ সবের মধ্যে রয়েছে ফিতরা, দান-খয়রাত, সাদাকা, এককালীন সাহায্য এবং সৎকার্যে ব্যয় করা ইত্যাদি। এ সব পথে ধন-সম্পদ প্রদানের জন্য পবিত্র কালামে বহু উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মানুষকে কষ্ট দিয়ে জিনিষ-পত্র গুদামজাত করা ইসলামী মতে মহাঅপরাধ। তেমনিভাবে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর একচেটিয়া অধিকার বা হস্তক্ষেপ অথবা এ ধরনের যে কোন অন্যায় পদক্ষেপে যাতে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে,—ইসলামী দৃষ্টিতে অবৈধ ও অমার্জনীয় অপরাধ। আর এসব দেখাশুনার দায়িত্বভার একমাত্র সরকারের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

অপর পক্ষে, জনসাধারণ যদি আকস্মিকভাবে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পতিত হয় অথবা একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে, তবে জীবন ধারণের যাবতীয় উপকরণ বিনামূল্যে সরবরাহ করার জন্য বিত্তবানদের বাধ্য করতে হবে। তা'ছাড়া, এরূপ সংকট সময়ে ধনবান ব্যক্তিবর্গ যথা-সম্ভব টাকা পয়সা অভাবগ্রস্তদের ধার দেয়া মহৎ কাজ বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহাকে করযে হাসানা বা উত্তম করয বলা হয়েছে।

—"আল্লাহ্‌পাককে তোমাদের মধ্য হতে কে করযে হাসনা দিতে প্রস্তুত আছে! তিনি ঐ করযে হাসনাকে বৃদ্ধি করবেন পরকালে তাহারই উপকারার্থে।—

খাদ্য-দব্য উৎপাদন করে বাজারে সরবরাহ করত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করার প্রতি মহানবী (সঃ) উৎসাহ দান করেছেন। তিনি বলেছেন,—"যে কোন মুসলমান একটি বৃক্ষ রোপন করবে অথবা কৃষি-কাজ করবে, তার ফল যদি কোন পক্ষী অথবা মানুষ অথবা অন্য কোন প্রাণী ভক্ষণ করে, তবে তা' উক্ত ব্যক্তির দান হিসেবে গন্য করা হবে।"

—আল্-হাদীস

ইসলাম জায়গীরদারি প্রথা মোটেই সমর্থন করেনা, এমন কি সারা বছর জমি অনাবাদী ফেলে রাখাও সমর্থন করে না। আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)-কে 'ওয়াদীয়ে আতীক' নামক স্থানে কিছু জমি দান করেছিলেন, অথচ হযরত উমর (রাঃ) উক্ত জমি-খণ্ড হযরত বিলাল (রাঃ) হতে ফেরত নিয়ে যান। হযরত বেলাল (রাঃ) এ ব্যাপারে হযরত উমর (রাঃ) এর সাথে একমত হলেন না। তথাপি তিনি হযরত বিলাল (রাঃ)-কে এতটুকু জমি দেন যাহা তাহার পক্ষে চাষাবাদ করা সম্ভব। অবশিষ্ট জমি হযরত উমর (রাঃ) মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দেন।

চার প্রকার সম্পত্তিতে ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত নয়। এগুলি হ'ল ঃ (১) যে সব চারণ-ভূমি জনবসতির নিকটবর্তী, (২) যে সব জমির গাছ-গাছড়া দ্বারা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করা হয়, (৩) লবণের খনি (৪) নদী বা দরিয়া।

চারটি জিনিসের মধ্যে ইসলাম প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার প্রদান করেছে। এগুলি হল ঃ—(১) প্রাকৃতিক পানি সম্পদ, (২) স্বয়ম্ভু-তৃণ ঘাস (৩) খনিজ লবণ, (৪) স্বয়ম্ভু গাছপালা হতে সংগৃহীত জ্বালানী কাঠ ও আগুন।

নবীজী (সঃ) ইরশাদ করেছেন, ঃ সমগ্র মানব সমাজ তিনটি জিনিসে সমান অংশীদার—(১) পানি, (২) ঘাস, (৩) আগুন। "বনের মধ্যে কিংবা কোন গর্তে বৃষ্টির পানির উপর যদি কেহ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং জনসাধারণ ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবকে সেই পানির ব্যবহার হতে বঞ্চিত করে, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তার সাথে সহৃদয়ভাবে কথা বলবেন না। বরং ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বলবেন—"তুমি আমার বান্দাগণকে আমার দান হতে বঞ্চিত করেছিলে, সুতরাং আজ আমি আমার দান হতে তোমাকে বঞ্চিত করব।" (আল্ হাদীস) একচেটিয়া কোন সম্পদের উপর আধিপত্য বিস্তার করার বিরুদ্ধেও কালামে পাকে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

মোট কথা, পবিত্র কুরআনে এমন এক মহান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে যা বিশ্বের মানব-রচিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হতে স্বতন্ত্র ও অতি উত্তম। কিন্তু কুরআনী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান এবং পাশাপাশি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক পদ্ধতিও বিরাজমান। বর্তমান সময়ে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার প্রবল বিরোধ ও সংঘাতকে একমাত্র কুরআনের অর্থ ব্যবস্থাই সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম। সুতরাং আধুনিক বিশ্বের দুই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংঘাত হতে মুক্তি পেতে হলে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অর্থনীতি গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

শাসনতান্ত্রিক কাঠামো রচনায় কুরআনের ঘোষণা

ইসলামের দৃষ্টিতে এ পৃথিবীর প্রকৃত মালিক হলেন মহাপরাক্রমশালী ও পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা। মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার খলীফা বা প্রতিনিধিমাত্র। সুতরাং মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে এমন একটা বিশ্বরাষ্ট্র কায়েম করা যাকে সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌র 'খিলাফত' বা 'রাষ্ট্র' বলা যেতে পারে। এ রাষ্ট্রের আইন-কানুন রচয়িতা মানুষ নয়, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি মানুষের মাধ্যমে শুধু এসব আইন-কানুন বাস্তবায়িত হবে। এ রাষ্ট্রব্যবস্থা একদিকে নির্ভেজাল আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করবে, অপর দিকে বিশ্ববাসীর রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চয়তা বিধান করবে। ইসলামের মতে, উক্ত বিশ্ব-রাষ্ট্রে এমন একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা হবে যার মাধ্যমে তারা জগত, দেশ ও জাতি তথা ভৌগোলিক সীমারেখার সংকীর্ণতা-মুক্ত হবে। বৈষম্যহীনভাবে ন্যায়নীতি, সুখ-শান্তি ও কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থায় সমৃদ্ধ হবে। এ রূপে মানুষ পারলৌকিক তথা চিরন্তন সুখ লাভের জন্য ও উক্ত ব্যবস্থাকে আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে উক্ত রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ঘোষণা করেছেন। তবে সে কাঠামো বিশ্বের প্রচলিত শাসনতন্ত্রের মত শিরোনাম ও অধ্যায় বিশিষ্ট নহে। বলা চলে, আল্লাহ্ তা'আলা শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর কতকগুলি মৌলিক নীতিমালা ঘোষণা করেছেন। সেগুলি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের উল্লেখে একটা বৈচিত্র রয়েছে যা মানুষ রচিত কোনও গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। সে যা' হোক, আল্লাহ্ তা'আলার খলীফা মানুষকে সে সব মৌলিক নীতিমালার আলোচনা, বিস্তারিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে। আমরা এখানে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মৌলিক নীতিমালার উপর আলোকপাত করে পবিত্র কুরআনের কতকগুলি আয়াত উল্লেখ করছি :

কুরআনের মতে, রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি পদ (রাষ্ট্রপতির পদ থেকে শুরু করে সামান্য পিয়নের পদ পর্যন্ত) অবশ্য জনগণের পক্ষ হতে আমানত এবং রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ ও পদ শাসকগণের হাতে আমানত স্বরূপ। তারা পদের ও সম্পদের অধিকারী নহে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা একমাত্র

আল্লাহ্‌ তা'আলার। ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর বা প্রেসিডেন্ট আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতিনিধিমাত্র। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"আল্লাহ্‌র জন্যইত আসমান জমীনের আধিপত্য আর এ দু'য়ের মাঝখানে যা'কিছু রয়েছে সে সবের মালিকানাও একমাত্র তাঁরই, তিনি নিজের খুশীমত সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্‌ পাক সকল বিষয়ে শক্তির একমাত্র অধিকারী।" (৫ ঃ ১৭)

মানুষকে তিনটি জিনিস ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিয়ে থাকে, এগুলি হ'ল (১) কোন সম্প্রদায়ের সাথে শত্রুতা, (৩) জাতীয় স্বার্থের বিষয়, (৩) কোন সম্প্রদায়ের সাথে অতিরিক্ত বন্ধুত্ব। আল্লাহ্‌ পাক জুলুম ও অত্যাচারের উক্ত কারণ তিনটি দূর করার জন্য দু'টি পৃথক আয়াত নাযিল করেছেন ঃ

—"কোন জাতির সহিত হিংসা বিদ্বেষ বা শত্রুতা ভাব যেন তোমাকে ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে প্ররোচিত না করে।" —সূরা মায়েদা

—"তুমি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা আর আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তাহা নিজের পিতামাতার এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হউক না কেন।" —সূরা নিসা

রাষ্ট্রের আবশ্যক মুসলমানদের মধ্য হতে ভৌগোলিক, জাতীয় বংশগত এবং ভাষাগত গোঁড়ামী দূর করত ইসলামী মিল্লাতের ঐক্য গঠনে চেষ্টা করা। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

আল্লাহ্‌ তা'আলা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদের এক দল কাফের ও আর এক দল মুমিন হিসেবে পৃথক করেছেন।

—"নিশ্চয়ই মুসলমান সব ভাই ভাই।"

—"আমি তোমাদিগকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন বংশে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট মুত্তাকীগণই সম্মানী।"

ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মধ্যে এও একটি উল্লেখযোগ্য দফা যে, অমুসলিম বাসিন্দাদের ধর্ম ও জান-মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এ ব্যাপারে মুসলিম অমুসলিমের মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য করা চলবে না। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেন ঃ

মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলমানদের জান, মাল ও সম্মান আমাদেরই জান মাল ও সম্মানের মতন, কেউ তাদের প্রতি কোন প্রকার যুলুম করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)। হানাফীদের মতে যদি কোন মুসলমান কোন অমুসলমানকে হত্যা করে তবে তার বদলে ঐ মুসলমান হত্যাকারীকে হত্যা করতে হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদের আল-কাফিরূন সূরায় তাদের সঙ্গে আমাদের সহঅবস্থানের হুকুম দিয়েছেন। তাদের ধর্মে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা চলবে না। পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে "লা ইকরাহা ফিদ্দীন," ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই। (সূরা বাকারা)

রাষ্ট্রের কোন অমুসলমানকে মুসলমান হওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবেনা বরং অমুসলিমকে তার নিজ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি স্বাধীনভাবে পালন করার পূর্ণ অধিকার প্রদান রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব।

রাষ্ট্রপতির গুণাগুণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা খুবই কঠোর।

(ক) রাষ্ট্রপতিকে মুসলমান হতে হবে, কাফির হলে চলবে না,

(খ) সৎপ্রকৃতির হতে হবে, অত্যাচারী ও অসৎ হলে চলবে না,

(গ) রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।

(ঘ) শৌর্য-বীর্য, শক্তি-সাহস, ও দৈহিক শক্তিসম্পন্ন হতে হবে।

এ ব্যাপারে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন কতিপয় অগ্নি পরীক্ষায় আল্লাহ্র অনুগ্রহে উত্তীর্ণ হলেন, তখন তিনি (আল্লাহ্ পাক) বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানবমণ্ডলীর নেতা করব। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেন, "আমার বংশধরগণের মধ্য হতেও"। তিনি (আল্লাহ্) বলেছিলেন, "আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের প্রতি পৌঁছেনা।" এ ঘটনায় রাষ্ট্রপতি আল্লাহ্ পাকের অনুগত ও সৎ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তারপর তালুতকে বাদশাহ নিযুক্ত করা সম্পর্কেও কয়েকটি যোগ্যতার কথা কুরআনে আছে। সেগুলোতে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার ব্যাপারে স্বচ্ছ অভিজ্ঞতা ও শারীরিক শক্তির কথা উল্লেখ রয়েছে।

অতি সংক্ষেপে, শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে এখানে কুরআন পাকের কতিপয় আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাতে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর প্রয়োজনীয় দফাগুলি প্রায় সবই উল্লেখ করা হয়েছে। গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা করলে পবিত্র কুরআন হতে একটা পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু

শাসনতন্ত্র মানব জাতির বৃহত্তর ও স্থায়ী কল্যাণের জন্য রচনা করা সম্ভব। আসল কথা, ইসলামের সকল প্রকার বিধি-বিধান, শাসনতন্ত্র ও আইন-কানুন সম্পর্কে কুরআন শুধু ইঙ্গিতই করেছে। এসবের যথার্থ ব্যাখ্যা ও বাস্তব জীবনে রূপায়িত করেছেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সঃ) ও খুলাফায়ে রাশিদীন। সুতরাং পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি, মহানবী (সঃ) ও তাঁহার সাহাবা, ইমাম, মুজতাহিদ তথা ইসলামী গবেষক ও চিন্তাবিদদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সামনে রেখে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে। আর সত্যিকার ইসলামী শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমেই ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় তথা মানব জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান অতি সহজে করা সম্ভব।

বিজ্ঞান চর্চায় কুরআনের প্রেরণা

আল্লাহ্ পাক নিজেই তাঁর এ পবিত্র ও জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থকে বিজ্ঞানময় কিতাব বলে উল্লেখ করেছেন। নানা বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে রহস্য উদঘাটন করা ও গূরুত্ব বের করত একটা সিদ্ধান্তে আসাই হল বিজ্ঞানের কার্যক্রম। সেজন্য কুরআনের সর্বপ্রথম যে নির্দেশ এসেছে তা' হল "ইক্‌রা" অর্থাৎ—পড়। পবিত্র কুরআনে সর্বপ্রথম মানব জাতিকে পড়া-শোনা করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। কারণ, কোন বিষয়ে না পড়লে বা না শিখলে জ্ঞানলাভ হয়না। বিশ্ব মানব ও বিশ্ব প্রকৃতিকে বুঝা ও জানার জন্য গবেষণা করার বহু সূত্র এ কুরআনে বিদ্যমান। এখানে পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক কতকগুলি আয়াত উল্লেখ করা হ'ল। আধুনিক বিজ্ঞান এ সত্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে যে. উদ্ভিদ, এমনকি জড় পদার্থের মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষ জাতি রয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের এ ব্যাপারে গবেষণার খোরাক চৌদ্দশত বছর আগে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

—"সকল মহিমা একমাত্র আল্লাহ্‌র। যিনি স্ত্রী ও পুরুষ হিসাবে সকল বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন।" (৩৬ : ৩৬)

—তিনি (আল্লাহ্) পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করেছেন এবং তাতে স্থাপন করেছেন নদ-নদী এবং প্রতিটি ফলকে (স্ত্রী-পুরুষ) জোড়া হিসাবে সৃষ্টি করেছেন।" (১৩ : ৩)

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতি নিজ নিজ কক্ষপথে ভ্রমণ করে এবং এগুলি স্বাভাবিক নিয়মেই চলাচল করে। সৌরজগত সম্বন্ধে চৌদ্দশ বছর পূর্বে পবিত্র কুরআন যা প্রকাশ করেছে বৈজ্ঞানিকগণ তার বেশী কিছুই বলতে পারেন নি। তারা গবেষণা ও পরীক্ষা চালিয়ে কুরআনের ঘোষণাকেই প্রমাণ করেছে। কুরআন পাক ঘোষণা করেছে :

চন্দ্র-সূর্যকে ধরার কোন সাধ্য নেই, রাত্রিও দিনকে অতিক্রম করার ক্ষমতা নেই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে ভেসে বেড়াচ্ছে। (৩৬ : ৪০)

—দু'টি দরিয়ার স্রোত কখনও একইরূপ গণ্য হতে পারেনা। একটা মিঠা পানির স্রোত, যা পিপাসা দূর করে দেয়, আর একটা লবণাক্ত বিস্বাদ। কিন্তু এ দু'টি বিপরীত-ধর্মী। প্রত্যেকটি হতে তোমরা টাটকা গোশ্‌ত

খেয়ে থাক। তাহা হতে বের করে নিয়ে আস অলংকার, যা তোমরা পরে থাক। তোমরা দেখতে পাবে জাহাজগুলি কিভাবে পানির বুক চিরে এগিয়ে যাচ্ছে, যাতে তোমরা তাঁরই দান-সামগ্রী খুঁজতে পার। আর যেন তোমরা তাঁরই শোকর আদায় করতে পার।" (৩৫ : ১২)

আল্ কুরআন মানবকে বিশ্ব প্রকৃতির অসংখ্য সম্পদরাজি সম্বন্ধে ও নিজ সম্বন্ধে অনুধ্যান ও গবেষণা করার জন্য প্রেরণা দিয়েছে। কুরআনের প্রেরণা-বাণী পেয়ে জ্ঞানী সমাজ প্রকৃতি রাজ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডারকে আয়ত্বে আনতে সক্ষম হয়েছে। সমুদ্র বক্ষ থেকে মূল্যবান পাথর মুক্তা তুলতে সমর্থ হয়েছে। অনেক নদ-নদী ও মাটির গর্ত হতে স্বর্ণরেণু, লোহার খনি, তেলের খনি ইত্যাদি খনিজ সম্পদের সন্ধান পেয়েছে।

"এ দু-য়ের তলা হ'তে মুক্তা ও মানিক বাহির হয়। সুতরাং শোন হে জিন ও মানব জাতি। তোমরা নিজেদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ নিয়ামতকে মিথ্যা জানবে ?" (৫৫ : ২২-২৩)

"অতঃপর নামায শেষ করার পর পরই জমীনের বুকে ছড়িয়ে পড়। আল্লাহ্‌র প্রদত্ত সম্পদসমূহ (খনিজ, বনজ ও কৃষিজ) অনুসন্ধানে লেগে যাও এবং প্রচুর পরিমাণে আল্লাহ্‌র জিকির (স্মরণ) কর।" (সূরা জুমা)

পবিত্র কুরআন বলে দিয়েছে—চন্দ্র,সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্ররাজি, মেঘমালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখী, লতা-পাতা, বৃক্ষাদি তথা বিশ্ব প্রকৃতির সবকিছুই মানব জাতির ভোগের ও ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতি হতে মানুষ তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অনুসন্ধান করে নিবার জন্য পবিত্র কুরআন উৎসাহ ও তাগিদ দিয়েছে।

"তুমি কি দেখছ না কিভাবে আল্লাহ্ আসমান ও জমীনে এবং উহাদের মাঝখানে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুই তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। (৩১ : ২০)

"তিনি নক্ষত্ররাজিকে তোমাদের জলে, স্থলে ও অন্ধকারে চলার জন্য সৃষ্টি করেছেন।" (৬ : ৯৭)

"নিশ্চয়ই পশুদের নিকট হ'তে তোমাদের জ্ঞানের বিষয় আছে। আমি এদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হ'তে দুধ বের করি তোমাদের পান করবার জন্য।" (১৬ : ৬৬)

মহান আল্লাহ্ পাক মানব জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্যে বিজ্ঞানময় কুরআন মানব জাতির মধ্যে নাযিল করেছেন। আল্লাহ বলেন,

"হে নবী, আপনি মানুষদিগকে মনোজ্ঞ উপদেশ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উৎকৃষ্ট যুক্তি তর্কের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পথে ডাকুন।" (১৬ : ১২৫)

"যাকে ইচ্ছা তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করেন এবং জ্ঞান বিজ্ঞান যে লাভ করেছে তার যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হয়েছে।" (২ : ২৬৯)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্যপূর্ণ এ মহাগ্রন্থ যাঁর উপর নাযিল হয়েছিল, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিরূপ উৎসাহ প্রদান করেছেন, তাও আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

(ক) "জ্ঞান-বিজ্ঞান সন্ধান করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ।" (ইব্‌নে মাজাহ্‌)

(খ) "জ্ঞানগর্ভ বাক্য পথভ্রষ্ট মেষের মত, ইহা জ্ঞানবানের কাছেই বিবেচিত হয়, জ্ঞানিগণ যেখানে পায় সেখান হতেই গ্রহণ করে।" (ইব্‌নে মাজাহ্‌, তিরমিজী)

(গ) "যে ব্যক্তি নিজ বাসস্থান ত্যাগ করে কুরআনের জ্ঞান হাসিল করতে অগ্রসর হয়, সে আল্লাহ্‌র পথেই ভ্রমণ করে।" (তিরমিযী)

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর প্রেরণা লাভ করে সেকালে অনেক মুসলিম মনীষী জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। বিজ্ঞান জগতে তাদের অবদান অসামান্য। তাদের বৈজ্ঞানিক তথ্য ও আবিষ্কার আজো বিজ্ঞান জগতে পথিকৃতের মর্যাদা লাভ করে আছে। আমরা এখানে সেসব মনীষীর অবদান সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করব।

আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের জনক বলা হয়ে থাকে মুসলিম বৈজ্ঞানিক আল সাবের্‌কে। তিনি রসায়ন শাস্ত্রের উপর প্রায় পাঁচ শত পুস্তক রচনা করেন। বাষ্পীভবন, ঊর্ধ্বপাতন, দ্রবীকরণ, স্ফটিকীকরণ, তিনি আবিষ্কার করেন। তিনি প্রথমে ক্ষার, এসিড, গন্ধক, দ্রাবক, জল-দ্রাবক, রৌপ্য ক্ষার, ও অন্যান্য যৌগিক সূত্র বের করেন।

খলীফা আল্‌ মামুনের রাজত্বকালে আল্‌ কাসিম নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক হাওয়াই জাহাজ আবিষ্কার করেন। পরীক্ষামূলক উড্ডয়নকালে ঐ হাওয়াই জাহাজ ধ্বংস হয়। এ দুর্ঘটনায় আল্‌ কাসিম নিজেও নিহত হন।

আব্বাসীয় আমলে আর্‌-রাবী, আল্‌ আব্বাস, ও ইব্‌নে সীনা চিকিৎসা বিজ্ঞানে পৃথিবীর ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন।

আর্-রাবী সম-সাময়িককালের চিকিৎসা বিজ্ঞানী। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল্ জুদারী আল্ হাস্বাহ্ (On small pox and Measles) পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয় এবং প্রায় চল্লিশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা গ্রন্থ আল্ হাউই (The Comprehensive Bock) বিশটি খণ্ডে সমাপ্ত।

আল্ আব্বাসের 'আল্ কিতাব' আল্ মালিক (The whole Medical Art) ও ইব্নে সীনার "কানুন আল্ হিকমাহ্" (Canon of Medicine) মধ্যযুগে সমগ্র বিশ্বে 'মেডিবেল বাইবেল' হিসেবে সমাদৃত ছিল। ইব্নে রুশদ ভেষজ বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তিনি পৃথিবীর বহুস্থান হ'তে ঔষধপত্র সংগ্রহ করে সে সবের প্রয়োগ সম্পর্কে পরীক্ষা নিরক্ষা চালান এবং অনেক প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কার করেন।

মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী লতিফ ইব্নুস বায়তার লতা-পাতা হতে চোদ্দশত (১৪ শত) ঔষধের একটি তালিকা তৈরী করেন। মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবুল কাসিম ছিলেন আধুনিক শল্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। ল্যাটিনদের কাছে তিনি 'বুকাসিম' নামে পরিচিত। তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ আত্তাসরিক (Medical Vade Mecum) ত্রিশ খণ্ড বিভক্ত। এ গ্রন্থে অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। স্বয়ং নবীজীই হযরত সায়াদ বিন্ মোয়াজের বাহুতে বিদ্ধ তীর খোলার জন্য একে একে দুইবার অস্ত্রোপচার করেছিলেন।

কুরআনের সেকালের অনুসারী মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে সব অবদান রেখে গিয়েছেন, তন্মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) ইব্নে রুশদ-এর সূর্য কলংক আবিষ্কার ;
(২) পরিমাপ যন্ত্র উদ্ভাবন ;
(৩) আবু মুসার চন্দ্রের প্রভাবে জোয়ার-ভাটার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা ;
(৪) ইব্রাহীম আল্ ফাজরীর সমুদ্র পৃষ্ঠ হ'তে ভূমির উচ্চতা নিরূপণ যন্ত্র আবিষ্কার ;
(৫) ইব্নে মজিদের দিগ্ দর্শন যন্ত্র আবিষ্কার ;
(৬) আবুল হাসানের টেলিস্কোপ আবিষ্কার ;
(৭) খলীফা আল্ মামুন কর্তৃক বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপন
(৮) আবু মুসার তত্ত্বাবধানে দক্ষিণ স্পেনে সর্বপ্রথম মানমন্দির প্রতিষ্ঠা ;

(৯) আল বিরুণী কর্তৃক পৃথিবীর গোলাকার মানচিত্র প্রস্তুত, প্রভৃতি।

পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি বিজ্ঞানের অনুশীলনকে উৎসাহিত করেছেন। কুরআনের প্রেরণা অনুযায়ী মুসলমানেরা ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল। ১৪৯৮ সালে পর্তুগীজ ভাস্কো ডা গামাকে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে পথহারা দেখে মুসলিম নাবিক আহমদ বিন্ মজিদ ভারতে পৌঁছবার পথ দেখিয়ে দেন। ইবনুল আওয়ামের রচিত 'কৃষি বিজ্ঞান' গ্রন্থখানি কৃষি ক্ষেত্রে এক বিরাট অবদান। মুসলিম মনীষী আল্ ইদ্রীস সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ মানচিত্র অংকন করে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন।

তবে দুঃখের বিষয়, এসব মুসলিম বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের বিস্তারিত তথ্য আজকাল বড় একটা পাওয়া যায় না। অনেক কিছু আবার বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। বস্তুত কুরআনের অনুসারী এসব বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের সূত্র ধরেই আধুনিক বিজ্ঞান জগত অগ্রগতির নব দিগন্তে এগিয়ে চলছে।

পরিশেষে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের কথা মানব জাতিকে বলে দিয়েছেন। কুরআনের প্রায় প্রতিটি সূরা বা অধ্যায়ে আমাদের এ উক্তির জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করছে।

ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে প্রকাশ্য সমালোচনাকারী স্যার উইলিয়াম মুর পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, কুরআনের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বিধাতার পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত ও প্রকৃতি হতে গৃহীত অসংখ্য যুক্তি। তিনি বলেছেন ঃ

"The Koran abounds with arguments drawn from Nature and Providence."

কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অমুসলিম মনীষীদের অভিমত

বিশ্বের খ্যাতনামা অমুসলিম জ্ঞানী-গুণী সমাজের স্পষ্ট অভিমত পেশ করা হ'ল। এ সব জগদ্বিখ্যাত ও দেশবরণ্য মনীষী স্বার্থহীন ভাষায় পবিত্র কুরআনের প্রশংসা করেছেন। বস্তুত তাঁরা নিজেদের বিবেকের কাছে সাড়া দিয়েছেন এবং মানবতার রূপ প্রকাশ করেছেন। কুরআন সম্বন্ধে তাঁদের স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ অভিমতের জন্য তাঁরা প্রশংসার যোগ্য।

১. বিখ্যাত ভাষাবিদ পণ্ডিত ইমানুয়েল ডেস্ক্ বলেন—

কুরআনের সাহায্যে আরবরা মহান আলেকজাণ্ডারের জগৎ হতে বৃহত্তর জগৎ, রোম সাম্রাজ্য হতে বৃহত্তর সাম্রাজ্য জয় করে নিয়েছে। কুর-আনের অনুসারী আরব মুসলমানরা এসেছিল মানবজাতিকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করতে।

২. চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়ায় বলা হয়েছে ঃ

---কুরআনে অত্যাচার, মিথ্যা, অহংকার, প্রতিহিংসা, গীবত, লোভ, অপব্যয়, অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন, খিয়ানত এবং কারো সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করা ইত্যাদির নিন্দা করা হয়েছে। এটাই কুরআনের একটি মহান সৌন্দর্য।

৩. ফ্রান্সের ডঃ গস্তেওলীবাম বলেন,

"কুরআন মানুষের অন্তঃকরণে এরূপ জীবন্ত এবং শক্তিশালী ঈমা-নের প্রেরণা সৃষ্টি করে যাতে সন্দেহের লেশমাত্রও থাকতে পারেনা।

৪. প্রফেসর রেনল্ড নিকলসন বলেন,

"কুরআনের প্রভাবেই আরবী ভাষা সমগ্র ইসলাম জগতে পবিত্র ভাষা-রূপে সমাদৃত হয়েছে। কুরআন আরবের কন্যা হত্যার বিলোপ সাধন করেছে।

৫. মিঃ এস লিডর বলেন ঃ

কুআনের শিক্ষা হতেই দর্শন বিভাগের উদ্ভব হয়েছে এবং ইহা উন্ন-তির এরূপ চরম শিখরে পেঁাছেছিল যে, ইউরোপের বড় বড় সাম্রাজ্যের শিক্ষাকেও অতিক্রম করেছিল।

৬. জার্মান দার্শনিক জন জাক্ রীস্ক বলেন ঃ

"বিধর্মীরা যখন পয়গাম্বরের মুখে কুরআন শুনতো তখন তারা অস্থির হয়ে সিজ্দায় পড়ে যেত এবং ইসলাম গ্রহণ করত।

৭. মিঃ বেট্‌নলী লেনপুল বলেন ঃ

"একটি বড় মজহাবের জন্য যা আবশ্যক' কুরআনে তা সবই আছে এবং একজন মহান পুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মধ্যেও উহা ছিল।

৮. এইচ. জি. ওয়েলস্‌ বলেন ঃ

"কুরআন মুসলমানদেরকে এরূপ ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করেছে যা বংশগত এবং ভাষাগত ব্যবধান ও কোন পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারেনা।

৯. এডওয়ার্ড ডি. জি. ব্রাউন বলেন ঃ

আমি যতই কুরআনের আয়াতসমূহের বিষয় চিন্তা করি, উহার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করি, ততই আমার অন্তঃকরণে উহার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপর পক্ষে, যখন জেন্দাবেস্তা (পারসিকদের ধর্ম গ্রন্থ) কিংবা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ অতীত কালের ঘটনাবলী অথবা কোন গবেষণার জন্য অধ্যয়ন করি তখন উহা অন্তরে বোঝাস্বরূপ মনে হয়।

১০. ইসলামের ঘোর বিরূপ সমালোচক স্যার উইলিয়াম মূর বলেছেন ঃ

কুরআনের স্বাভাবিক এবং নৈসর্গিক দলিল-প্রমাণ দ্বারা আল্লাহ্‌ পাকের অস্তিত্বকে এরূপ প্রমাণিত করা হয়েছে, যা' মানুষের মনকে আল্লাহ্‌র তাবেদারী এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে।

১১. মিঃ এমানুয়েল ডি. উইন্‌স্‌ বলেন ঃ

"ইউরোপে কুরআনের আলো যখন পৌঁছে তখন ইউরোপ ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। এর মাধ্যমে গ্রীকদের লুপ্ত-প্রায় জ্ঞান-বিজ্ঞান পুনর্জীবিত হয়েছিল।

১২। প্রঃ দ্রী ওয়ালরসন ডি. ডি. বলেন ঃ

"কুরআনের ধর্ম শান্তি এবং নিরাপত্তার বাহক।"

১৩. ডীন স্টেনলী বলেন ঃ

"নিঃসন্দেহে কুরআনের আইন কানুন বাইবেলের আইন কানুন অপেক্ষা বেশী কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে।"

১৪. প্রফেসর কার্লাইল বলেন ঃ

"আমার অভিমত এ যে, কুরআনের মধ্যে সর্ব প্রকারের সততা এবং অকপটতা বিদ্যমান। সত্যকথা এই যে, সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য এরই প্রয়োজন।"

১৫. ডঃ গীবন বলেন ঃ

"কুরআন একত্ববাদের প্রধান সাক্ষ্য। একজন একত্ববাদী দার্শনিক

যদি কোন দিন ধর্ম গ্রহণ করতে চায় তবে তার পক্ষে ইসলামই উপযুক্ত। মোটকথা, সারা জগতে কুরআনের তুল্য ধর্মগ্রন্থ পাওয়া দুষ্কর।"

১৬. ফ্রান্সের দার্শনিক আলকাস লোযায়েজোন বলেন ঃ

"কুরআন একটি জ্ঞান-পূর্ণ ও জ্যোতির্ময় গ্রন্থ। আমরা (ইউরোপীয়গণ) বিজ্ঞানের যে সমস্ত বিষয় আমাদের খৃস্ট ধর্মের সহিত সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছি সেগুলোর সমাধান ইসলাম ধর্মে এবং কুরআনে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল।

১৭. গ্যেটে বলেন ঃ

"আমরা যতই গ্রন্থের (কুরআনের) নিকটবর্তী হই অর্থাৎ যতই মনোযোগ-সহকারে অধ্যয়ন করি ইহা ততই আমাদিগকে মুগ্ধ এবং আশ্চর্যান্বিত করে এবং পরিশেষে আমাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য করে। এরূপে এর প্রত্যেক অধ্যয়নকারীর অন্তরে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

১৮. পপুলার এনসাইক্লোপিডিয়ায় লিখিত আছে ঃ

"কুরআনের হুকুম আহকাম জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রকৃতির সহিত খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি কোন ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টিতে ইহা অবলোকন করে, তবে সে পবিত্র জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।"

১৯. রেভারেন্ড জে. মারগোলয়াথ বলেন ঃ

"দুনিয়ার ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে কুরআন একটি শ্রেষ্ঠতম স্থানের অধিকারী যদিও সর্বশেষ অবতীর্ণ গ্রন্থ হিসেবে সমসাময়িক ভাবধারার সহিত সংশ্লিষ্ট ; তথাপি বিরাট মানবমণ্ডলীর উপর আশ্চর্যজনক প্রভাব বিস্তারে ইহার তুলনা মিলেনা। ইহা মানবীয় চিন্তার বৃহত্তর ক্ষেত্রে নতুন ধরনের চরিত্রবত্তার সৃষ্টিকারী। এটা যে অতীত যুগে মানব জাতির চমৎকার সংশোধন করেছিল, তাই নয়, বরং বর্তমানেও আফ্রিকায় ঐ কাজ করছে।"

২০. ডুয়েশ বলেন ঃ

"কুরআনই একমাত্র কিতাব যার সাহায্যে আরবগণ আলেকজাণ্ডারের চাইতেও বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। এ সাম্রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণকল্পে তারা সকল প্রকার প্রয়োজনীয় কার্যক্রমে প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিল। তারা বিজয়ীর বেশে ইউরোপে এসেছিল এবং সেখানে মনুষ্যত্বের উপযোগী ভাবধারা সৃষ্টি করেছিল। তাদের আসার পূর্বে ইউরোপ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং অত্যাচার অবিচারে জর্জরিত।

ইফাবা-উ/৮৭-৮৮/প্র-১৬১১/৩,২৫০